উৎসর্গ

আমার আম্মা-আব্বার পবিত্র হাতে যারা আমাকে স্নেহে-শাসনে
মানুষ করার চেষ্টা করেছেন।

ও

উস্তাদতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী (র.)-এর
খিদমতে যিনি আমার চলার পথে অনুপ্রেরণার মশাল ধরেছিলেন।

-অনুবাদক

(28) نماز کی اہمیت وفضیلت (ارکان اربعہ)

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: مولانا ابوطاہر مصباحی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

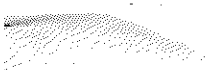

আমাদের কথা

আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধে বায়তুল্লাহ্‌মুখী হয়ে দাঁড়ানো মানুষের অন্তরে খুশু-খুযু তথা আর্দ্রতা ও একাগ্রতা সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষরূপে সহায়ক। এর মধ্যে এমন একটা অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে যে, গোলাম মহানুভব রাজাধিরাজ মহিমায় দরবারে বুকে হাত বেঁধে দন্ডায়মান। আর এ দন্ডায়মানের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সালাত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাজারে সালাত সম্পর্কিত অনেক বই-পুস্তক রয়েছে তা কেবল মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত। সেখানে সালাতের নিগুঢ় রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে তেমন কোন আলোকপাত করা হয়নি। অথচ যুগের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তি-তর্ক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষায়ন ভিত্তিক তথা সর্বোপরি কুরআনিক বিশ্লেষায়ন ভিত্তিক একটি পুস্তকের খুবই প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই আমাদের এ প্রয়াশ।

সালাত নামক পুস্তকটি মূলতঃ লেখকের স্বতন্ত্র কোন কিতাব নয়। লেখকের 'আরকানে আরবা'আ' শীর্ষক বইখানি ইসলামের চারটি প্রধান রুকন–সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কে লেখা। তারই একাংশ এ সালাত কিতাবখানি। এটা যুগ-ধর্মের প্রেক্ষাপটে যুক্তি-তর্ক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আলোচনাসমৃদ্ধ একটি অনবদ্য গ্রন্থ। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মসমূহের উপাসনার সাথে ইসলামী ইবাদতের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ইসলামী অনুশাসনমালার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এতে আলো ও আঁধারের পার্থক্য অনুধাবন করা যেমন সহজতর হয়েছে, তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের শাশ্বত নির্দেশমালার নির্যাস। গ্রন্থকার তাঁর আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, ইসলাম গুটিকয়েক প্রাণহীন অনুষ্ঠানের সংযোজন মাত্র নয়, বরং তা হচ্ছে যুগ-ধর্মের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটা বাস্তবসম্মত পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন। এ দর্শনে গোঁজামিলের কোন অবকাশ নেই। এটা হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম– সহজ-সরল পথ, যেখানে বক্রতার কোন স্থান নেই। পথের অনুসারীর অভীষ্ট লক্ষ্য একটাই–আর তা হচ্ছে মহান

স্রষ্টার মর্জি মাফিক জীবন পরিচালনা করে তাঁর নৈকট্য ও দীদার হাসিল করা।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ মনীষী আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী-র লেখা এ পুস্তকখানার অনুবাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন জনাব মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ। আল্লাহ্ তায়ালা লেখককে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। এবং অনুবাদকের সুস্বাস্থ্য ও কলমকে আরো মজবুত করে দিন।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স এ গ্রন্থ খানা বাংলায় অনুবাদ করে পাঠক সমাজে উপস্থাপন করতে পেরে আল্লাহ্র তা'আলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে। আল্লাহ্ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন–আমীন!

–প্রকাশক

লেখকের বক্তব্য

সকল প্রশংসা ও স্তুতি আল্লাহ্ পাকের। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীবের ওপর এবং তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের ওপর।

এ বইটিতে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদীর একটি রুকন তথা সালাত-এর হাকীকত ও তাৎপর্য এবং ইসলামী শরীয়তে সেগুলোর সঠিক স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই বুনিয়াদী ইবাদত-এর মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য, কল্যাণ, উপকারিতা, ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের ওপর এর সুগভীর প্রভাব সম্পর্কেও পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি ইবাদতের সেই ব্যাখ্যাই এখানে পেশ করা হয়েছে যা 'খায়রুল কুরূন' তথা ইসলামের 'কল্যাণ শতাব্দী-ত্রয়ের' দ্বীনী প্রজ্ঞার অধিকারী ও হাকীকতসচেতন মুসলমানগণ বুঝেছিলেন এবং যে ব্যাখ্যা ইসলামী ইতিহাসের বিশিষ্টতম ও আস্থাভাজন উলামায়ে দীনের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল ; ইসলামকে তাঁরা অনারবীয় কল্পনা বিলাসিতা ও দার্শনিক জটিলতা এড়িয়ে এবং চরমপন্থী মনোভাব ও অতিশয়োক্তি প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে মূল উৎস থেকে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত দীনকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বাইরের আমদানি করা ধ্যান-ধারণা কিংবা সমসাময়িক কোন মতবাদ দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত ছিলেন না এ পুণ্যাত্মাগণ। তদ্রূপ বুনিয়াদী রুকনগুলোর হাকীকত ও তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব এবং পদ্ধতি ও মূলনীতিসমূহকে নিজ নিজ সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের মানদণ্ডে বিচার করার মত হীনমন্যতাও তাঁরা প্রদর্শন করেন নি।

বইটি রচনাকালে লেখক কুরআন ও সুন্নাহ নতুন করে আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছেন এবং এ বুনিয়াদী রুকনের ওপর এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলোও পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এ ব্যাপারে লেখক সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন আইম্মায়ে ইসলামের (ইসলামী উম্মাহ্র সর্বজনবরেণ্য উলামায়ে দীন) গবেষণালব্ধ লেখনী দ্বারা যাঁদেরকে আল্লাহ্ ইসলামের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধির দুর্লভ নিয়ামত দান করেছিলেন। দীনের সমঝ যাঁদের ছিল সগভীর ও প্রান্তিকতা-শূন্য। ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আহকামে ইলাহীর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বর্ণনার ক্ষেত্রে যাঁরা অনুসরণ করেছেন শরীয়ত নির্দেশিত পথ ও সাহাবা কিরামের পছন্দনীয় পন্থা (যাঁরা ছিলেন আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ সম্বোধিত এবং যাঁদের ভাষায় নাযিল হয়েছে আল-কুরআন।)

দীনের ব্যাপারে এই সকল পুণ্যাত্মার ছিল সহীহ্ সমঝ ও অন্তর্দৃষ্টি, ছিল ইল্‌ম ও আমলের সমন্বয়। আর ছিল জীবনের সকল ক্ষেত্রে, অনুকূল-প্রতিকূল সমন্বয়। আর ছিল জীবনের সকল ক্ষেত্রে, অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মুজাহাদা। তাঁদের ইখলাস ও আত্মবিলোপ ছিল উম্মতের জন্যে অনুকরণীয়। ফলে হিদায়াত লাভের সকল পথই আল্লাহ্ তাঁদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। জটিল থেকে জটিলতর বিষয় তাঁদের জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন। কেননা "যারা আমার পথে মুজাহাদা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নিকট পৌঁছার) পথসমূহ প্রদর্শন করব ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ খাঁটি লোকদের সাথেই রয়েছেন।"

[সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯]

একদিকে এ সকল ইবাদতের রূহ ও হাকীকত তাঁদের দেহ আত্মার শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সেই রঙে তাঁরা রঞ্জিত হয়ে উঠেছিলেন। অন্য দিকে এমন ইল্‌ম ও প্রজ্ঞাও তাঁরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়, যার সহায়তা ছাড়া শরীয়তের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ধার করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। একদিকে তাঁরা বিশুদ্ধ নিয়ত, পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এ সকল ইবাদত পালন করেছিলেন। অন্যদিকে স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান ও বিরল পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে সেগুলোর রূহ্ ও হাকীকতও তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে প্রতিটি ইবাদতের হাকীকত ও তাৎপর্য, নিগূঢ় তত্ত্ব ও সুগুজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁদের পাক যবানে ও বরকতময় কলমে।

লেখক এ ব্যাপারে হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র.) বিরচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থটি দ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতুলনীয় এই গ্রন্থে শাহ সাহেব ইসলামের বুনিয়াদী রুকন সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তার সারনির্যাস এখানে এসে গেছে।

কুরআন ও সুন্নাহ-ই এই বইটির মূল ভিত্তি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় যা কিছু বর্ণিত হয়েছে প্রথমে তা গভীর একাগ্রতার সাথে অধ্যয়ন করা হয়েছে। অতঃপর পূর্ববর্তী উলামায়ে দীনের তাফসীর, টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত ও করুণাগুণে অধমের সামনে যে সকল অপ্রকাশিত দিক উদ্ভাসিত করেছেন, নিজের অগভীর জ্ঞান ও অপরিপক্বতা সত্ত্বেও সেগুলো উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিনি। তদ্রূপ প্রয়োজনবোধে আধুনিক ও সমসাময়িক লেখকদের গ্রন্থ থেকেও নিঃসংকোচে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। তবে তথ্য উপস্থাপন, ভাষাশৈলী ও বর্ণনা পদ্ধতির দিক থেকে বইটি যাতে যুগোপযোগী ও মানোত্তীর্ণ হয় এবং

কোথাও সামান্যতম রসহীনাতা অনুভূত না হয় আগাগোড়া সে চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন, শুধু আল্লাহ্‌র সীমাহীন করুণার বদৌলতে বইটি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় গুণাগুণের অধিকারী হয়েছে। বইটি এখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর রচিত গোটা ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম।

লেখক তার বইটিতে নতুন বংশধরদের সামনে পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহে গচ্ছিত মহামূল্যবান আমানত আধুনিক রুচিসম্মতভাবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পূর্বপুরুষদের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপন পদ্ধতির সাথে অপরিচয়ের ফলে বর্তমান বংশধরগণ তাদের ইল্‌ম ও হিকমত এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নির্মল উৎসধারা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, পূর্ববর্তীদের সাথে সম্পর্ক দিন দিন শিথিল হয়ে পড়ছে এবং আজিমুশ্‌ শান ইসলামী কুতুবখানা থেকে স্বচ্ছ জ্ঞান আহরণের পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য এটা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য চরম বিপর্যয়ের পূর্বাভাস।

ইসলামী উম্মাহ্‌ যেভাবে ইবাদতের শেকেল-আকৃতি এবং আহকাম ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের নিকট পৌঁছিয়েছে তদ্রূপ ইবাদতের রূহ্‌ ও হাকীকত এবং জীবন ও সমাজের ওপর এগুলোর প্রভাবও মহামূল্যবান উত্তরাধিকার সম্পদরূপে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। এভাবে ইবাদতের উভয় দিকেই অখণ্ড ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় আজ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাই এখন এ সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য ও হাকীকত সম্পর্কে নতুন করে এমন কোনো ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের অধিকার কারো নেই যা ইসলামী ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই এই উম্মাহ্‌র কাছে পরিচিত ছিল না। তদ্রূপ বাইরে থেকে ধার করা কোন পোশাক জবরদস্তি করে এগুলোর গায়ে চাপিয়ে দেয়ার ধৃষ্টতাও বরদাশ্‌ত করা যাবে না।

বইটি রচনাকালে লেখকের মনে হলো, অন্যান্য ধর্মের (ইতিহাসের কোন না কোন অধ্যায়ে, কোন না কোন উপায়ে যে ধর্মগুলো আসমানী শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যেগুলো আজো পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশের ধর্মরূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে) ইবাদত ব্যবস্থার ওপরও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা উচিত। এ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ইসলামী ইবাদত ব্যবস্থা, তার আহ্‌কাম ও দর্শনের সাথে অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ব্যবস্থা, আহ্‌কাম ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এমন সব সূত্র থেকেই অন্যান্য ধর্মের তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলো খোদ সংশ্লিষ্ট ধর্মের লেখক, চিন্তাবিদ, গবেষক ও বিদগ্ধ জনদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। তদ্রূপ

ইসলামী ইবাদতের ব্যাখ্যা দানকালে প্রথমত কিতাব সুন্নাহ্ এবং দ্বিতীয়ত সর্বজনমান্য উলামায়ে ইসলামের প্রামাণ্য গ্রন্থরাজির ওপর নির্ভর করা হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনাটি যাতে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও প্রান্তিকতাশূন্য হয় সেজন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও দিয়ানতদারির সাথে প্রতিটি ধর্মের সেই সারানির্যাসই উপস্থাপিত করা হয়েছে যা উক্ত ধর্মের আইন রচয়িতা ও শাস্ত্রবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

বস্তুত এটা খুবই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কেননা অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ব্যবস্থা ও বিধি-বিধানগত অবস্থা ইসলামী শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিপরীত দুই মেরুতে উভয়ের অবস্থান। একজন বিদগ্ধ গবেষককে ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে গিয়েও বিন্দুমাত্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় না। কেননা প্রতিটি ইবাদতের বিভিন্ন দিকের ওপর মওজুদ রয়েছে বিরাট গ্রন্থসম্ভার। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করতে গেলে তাকে অত্যন্ত অসহায়ভাবে মুখোমুখি হতে হয় সীমাহীন অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, দ্ব্যর্থতার ও অপূরণীয় একাডেমিক শূন্যতার, তথ্যের নিদারুণ স্বল্পতার। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ মেহেরবানীতে এ বইটিতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ব্যবস্থার এত দূর পর্যাপ্ত তুলনামূলক আলোচনা এসে গেছে, তা এক্ষেত্রে বিরাজমান শূন্যতার পরিপূরক।

এ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন এজন্যও ছিল যে, এর ফলে একজন মুসলমান গভীরভাবে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম আমাদের জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত ও বিনা পরিশ্রমে লব্ধ কত বড় নিয়ামত এবং এজন্য তাঁর পাক দরবারে আমাদের কী পরিমাণ শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সম্ভবত এটাই আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য।

তিনি বলেছেন, "খুবই আশংকা আছে, ঐ ব্যক্তি ইসলামের এক একটি করে ইট খুলে ফেলবে, যে জাহেলিয়াতের যুগ দেখেনি বরং ইসলামী যামানাতেই পৃথিবীতে চোখ মেলেছে (কেননা এটা সে উপলব্ধিই করতে পারবে না, শিরক্ ও কুফরীর কী ঘোর অন্ধকার থেকে ঈমান ও তাওহীদের কেমন স্নিগ্ধ আলোর দিকে আল্লাহ্ তাকে এনেছেন)"। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই এটা এক সম্প্রসারণশীল বিষয়বস্তু এবং চিন্তা ও গবেষণার এক সুবিস্তৃত ক্ষেত্র। হয়ত বিভিন্ন ধর্মের বিদগ্ধ গবেষক ও লেখক চিন্তাবিদদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। নতুন নতুন গ্রন্থ ও বিশ্বকোষ প্রণীত হবে। এ বইয়ের লেখকও, যদি জীবন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়–খোলা মনে সেগুলো অধ্যয়ন এবং আগামী সংস্করণগুলোতে সংযোজন করার জন্য সাগ্রহে প্রস্তুত রয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, লেখককে রোগ-শোক, হাজারো কর্মব্যস্ততা ও দায়িত্বভার সত্ত্বেও বইটির রচনাকার্যে হাত দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বেশ কিছু দিন থেকে এক শ্রেণীর লেখক, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মধ্যে একটা দুঃখজনক প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ অত্যন্ত নিঃসংকোচে ও বেপরোয়াভাবে আধুনিককালের বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সাথে যথাসাধ্য সঙ্গতি বজায় রেখে বস্তুতান্ত্রিক পরিভাষায় ইসলামী ইবাদতগুলোর স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দানকেই এরা ইসলামের অতি বড় খিদমত বলে ধরে নিয়েছেন। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ইবাদতগুলোর হাকীকত ও তাৎপর্য, কল্যাণ, উপকারিতা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে বিরাজমান এ নিদারুণ বিভ্রান্তি ও অরাজকতার প্রেক্ষিতে এ আশঙ্কা আজ খুবই জোরদার হয়ে দেখা দিয়েছে, এই বিশেষ চিন্তাধারায় প্রতিপালিত ও গড়ে ওঠা শ্রেণীটি, আল্লাহ্ না করুন, হয়তো একদিন ইসলামী শরীয়তের মূল রুকনগুলোর আসল হাকীকত ও তাৎপর্য, অন্তর্নিহিত কল্যাণ ও তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যে মহান উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত এ রুকনগুলো ফরয করা হয়েছে, সেগুলো একেবারেই বিস্মৃত হয়ে যাবে। বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও সংকীর্ণ আধুনিক পরিভাষার বদৌলতে ঈমান ও ইহ্তিসাবের ধারণাই আমাদের মন-মগজ থেকে অপসৃত হয়ে যাবে এবং স্থূল ও বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারা দাসত্ব ও ঐকান্তিকতার আত্মা বা স্পিরিটকেই গ্রাস করে ফেলবে। এটা এ বিশেষ চিন্তাধারার ধারক ও প্রচারকগণ অনুভব করুন বা না-ই করুন ইসলাম উম্মাহ্র জন্য সত্য সত্যই এক সর্বনাশা বিপদস্বরূপ! ইসলামী ইবাদতের হাকীকত, মূল উদ্দেশ্য ও প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তি ও বিকৃতির অতল গহ্বরে নিক্ষেপের এ প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।

বইটির রচনা কার্যে লেখকের আত্মনিমগ্নতা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছলো যে, অন্য কোন রচনা কিংবা গবেষণামূলক কাজে মনোযোগ দেয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ রইল না। গোটা একটা বছর এমনভাবে কেটে গেল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর বিস্তৃত পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনা প্রাচীন উৎস গ্রন্থগুলোর অতল গভীর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা ও কাজ ছিল না। এরপর শুরু হলো পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজ। এভাবে বইটির রচনাকালে শাব্দিক অর্থে লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিমণ্ডলেই দিন গুজরান করেছেন। বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। বলা যেতে পারে যে, এটা এই লেখকের একটা মুদ্রাদোষ কিংবা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ গায়েবী ইনতিজাম, কোন রচনা কাজে হাত দেয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর পরিমণ্ডলে সে এমনভাবে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে, বাইরের জগত ও তার কোলাহলের সাথে কোন যোগসূত্রই আর অবশিষ্ট থাকে না। শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য এটা যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক, আরব্ধ কাজটি কিন্তু সরস, সর্বাঙ্গীণ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

লেখক আজকাল নিজে লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তাই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা, হাদীসের উৎস খুঁজে বের করা, অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহের ব্যাপারে অন্যান্য বন্ধু ও স্নেহাস্পদের সহযোগিতা নিতে হয়েছে। এখানে শুকরিয়ার সাথে স্মরণ করছি স্নেহাস্পদ নিসারুল হক নদভী, মাওলানা তাকীউদ্দীন নদভী, আলী আদম আফরীকী, মুহাম্মদ সাঈদ আফরীকী, নজরুল হাফিজ নদভী, গিয়াসুদ্দীন প্রমুখের নাম। ইংরেজী উৎস গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহের অনুবাদ কার্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধেয় শাহেদ আলী সাহেব এম.এ. (ইংরেজি ভাষার শিক্ষক, নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ)-কে লেখক আন্তরিক সাধুবাদ পেশ করেছেন। লেখক ও পাঠকদের তরফ থেকে এঁদের সকলকে আল্লাহ্ পাক উত্তম বিনিময় দান করুন!

বইটির প্রথম আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'দারুল ফাতাহ্, বৈরুত থেকে ১৩৮৭ হিজরীতে। তিন-চার মাসের মধ্যেই সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। প্রকাশকের পক্ষ থেকে তাগাদা এলো, অচিরেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। লেখক পুনঃদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাইলে তা এখনি করা উচিত। প্রথম সংস্করণে বেশ কিছু ভুল রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রচণ্ড চাহিদার ফলে প্রকাশিত সংস্করণের ভুলগুলো হুবহু এ সংস্করণেও থেকে গেল। সম্ভবত ইতোমধ্যে তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়ে গেছে।

এক বছরের মধ্যে বইটির তুর্কী অনুবাদ প্রকাশিত হলো তুরস্কের 'কাওনা' থেকে। ইংরেজিতেও বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হলো অল্পকালের মধ্যেই এবং সংশ্লিষ্ট মহলে সমাদরও পেল। ভারতে সুধীমহলে সমাদৃত কয়েকটি পত্রিকা (মা'আরিফ ; বুরহান, সিদকে জদীদ) বইটির এমন উচ্ছ্বসিত সমালোচনা বের করল যা লেখক ও বইয়ের মান ও যোগ্যতার বহু ঊর্ধ্বে।

উর্দু অনুবাদের ভার দেয়া হলো লেখকের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ আল-হাসানীকে। লেখকের অন্য বইগুলোর মত এ বইটির অনুবাদেও সে অত্যন্ত সুচারুরূপে আ াম দেয়। পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখে দেয়ার সময় তথ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংশোধন ও সংযোজন করে। ফলে অনুবাদটি এখন আরো পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্যরূপে উর্দুভাষী পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হচ্ছে। এ বইটি এক সুদীর্ঘ অধ্যয়ন, গবেষণার ফসল ও সারনির্যাস এবং এর মাধ্যমে অন্ততপক্ষে একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক বিষয়ের ওপর উদার গবেষণার নব দ্বার উন্মোচিত হবে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের!

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরা শাহ্ আলামুল্লাহ্, রায়বেরেলী, ভারত।

সূচি

প্রথম অধ্যায়

সালাত ঃ গুরত্ব ও তাৎপর্য

রব ও আবদের সম্পর্ক/২৩
সম্পর্কের ভিত্তি/২৩
আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সিফাতের গুরুত্ব/২৪
মানুষ বৈপরিত্যের আধার/২৫
মানুষের সহজাত প্রেম ধর্ম/২৬
আত্মসমর্পণের সহজাত প্রেরণা/২৭
আদর্শ সত্তার অপরিহার্যতা/২৮
মানুষ ও স্রষ্টার সম্পর্কের রূপ নির্ণয়/২৮
এ বিশ্ব জগৎ ইবাদতে মশগুল/৩১
সৃষ্টি জগতে মানুষের স্থান ও বৈশিষ্ট্য/৩৪
মানুষের উপযোগী ইবাদত পদ্ধতি/৩৬
সালাতের সংখ্যা হ্রাসের হিকমত ও মনস্তাত্ত্বিক সুফল/৩৭
আল-কুরআনে-এর দৃষ্টান্ত/৩৮
সালাত এক আধ্যাত্মিক খোরাক/৩৯
সালাতের প্রাত্যহিকতার হিকমত/৪১
ইসলামে সালাতের গুরুত্ব/৪২
সালাত তরক করার পরিণাম/৪৬
আরও একটি উদাহরণ/৪৭
মাছের জন্য পানি ও মুমিনের জন্য সালাত/৪৮
সালাত মমতাময়ী মায়ের মত/৪৯
দেহ, বুদ্ধি ও হৃদয়ের ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব/৫১
হিকমতপূর্ণ অলৌকিক তরবিয়াত পদ্ধতি/৫২
কিবলার তাৎপর্য/৫৩
তাকবীরের তাৎপর্য/৫৬
সালাতের প্রারম্ভিক দু'আ ও যিকির/৬০

সূরা ফাতিহার তাৎপর্য/৬২
সিজদার তাৎপর্য/৬৮
দরূদ পাঠের হিকমত/৭১
মু'মিনের আত্মবিশ্বাস ও শ্রেণী নির্ণয়/৭৪
সালাতে সুসমাপ্তি/৭৫
সালাত গায়রুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ/৭৬
চরিত্র গঠনে সালাতের প্রভাব/৭৮
সালাতের প্রস্তুতি ও পরিবেশ/৮০
আযান/৮০
পবিত্রতা ও তাহারাতের গুরুত্ব/৮২
মসজিদের ভূমিকা/৮২
সালাতের আনুষঙ্গিক কতিপয় আদব/৮৫
জামা'আতের গুরুত্ব ও মর্যাদা/৮৬
জামা'আতের বিভিন্ন হিকমত ও কল্যাণকর দিক/৮৮
সালাতু'ল-জুমু'আর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য/৯০
জুমু'আ গোটা সপ্তাহের মানদণ্ড/৯৩
দুই 'ঈদ/৯৪
দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ হিফাজতের ক্ষেত্রে জুমু'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব/৯৬
অন্যান্য ধর্মের সালাত//৯৮
ইয়াহুদী ধর্মে/৯৮
রোমান ও ক্যাথলিকদের নামায/১০২
প্রোটেস্টট্যান্ট দলের সালাত পদ্ধতি/১০৪
হিন্দু ধর্মের আরাধনা ও উপাসনা/১০৫
সুন্নত নফল ও বিত্‌র/১০৯
সালাত বিপদের বন্ধু/১১২
তাহাজ্জুদের তাৎপর্য ও দায়ীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা/১১৩
নফল ও অধিক ইবাদতের সুফল/১১৮
সালাত ও মুসল্লীদের মর্যাদার পার্থক্য/১১৯
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর পর সালাত ও কুরআনের গুরুত্ব/১২২
সালাতের বাহ্যরূপ ও মর্ম উভয়ের সংরক্ষণই ফরয/১২৫
মুসলিম উম্মাহ্‌র সংস্কারক ও কর্ণধারদের কর্তব্য/১২৭
আমাদের প্রকাশিত বইয়ের তালিকা/১২৮

সালাতঃ গুরত্ব ও তাৎপর্য

সালাত

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"তোমরা সালাত কায়েম করো আর মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না।"

[সূরা রূম ঃ ৩১]

প্রথম অধ্যায়

সালাতের হাকীকত ঃ কল্যাণ ও তাৎপর্য

রব ও 'আব্‌দের সম্পর্ক

সালাতের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করা এমন ব্যক্তির পক্ষেই শুধু সম্ভব যিনি রব ও 'আব্‌দ তথা স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে বিরাজমান অতুলনীয় মহিমান্বিত ও আশ্চর্য-মধুর সম্পর্কের বিষয়টি পূর্ণরূপে অবগত।

এ এমন এক সুমহান সম্পর্ক যার উদাহরণ অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। শিল্পীর সাথে তার অমর শিল্পকর্মের, শাসকের সাথে শাসিতের, সবলের সাথে দুর্বলের, অকৃপণ দাতার সাথে কৃতজ্ঞচিত্ত গ্রহীতার, এক কথায় এই সুবিশাল সৃষ্টি জগতের কোন সম্পর্কের সাথেই এর তুলনা করা চলে না। কেননা রব ও 'আব্‌দের এ সম্পর্ক আরো সূক্ষ্ম, মহিমান্বিত, দৃঢ়, গভীর, ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সম্পর্কের ভিত্তি

রব ও 'আব্‌দের মাঝে বিরাজমান সম্পর্কের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে সর্বাগ্রে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সিফাত ও গুণাবলীর একটা নিখুঁত ধারণা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। কেননা সিফাত ও গুণাবলীই হচ্ছে বিরাজমান সকল সম্পর্কের উৎস। সিফাত থেকেই ঘটে এর উন্মেষ। যে কোন দু'টি সত্তার গুণগত ধারণা লাভে ব্যর্থ হলে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সঠিক রূপও কিছুতেই আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হব না।

জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে যেসব সম্পর্কের সাথে আমরা জড়িয়ে পড়ি যার ফলে আইন ও সামাজিক নীতিমালার জন্ম হয়, হয় সমাজ সভ্যতার গোড়া পত্তন, মূলত সেগুলো মানুষের মানবীয় গুণাবলীরই ফসল। আর এরই সুস্পষ্ট ছাপ মানুষের সমাজে আমরা সদা প্রত্যক্ষ করছি।

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সিফাতের গুরুত্ব

এজন্যই সকল আসমানী ধর্মগ্রন্থ ও গ্রন্থ সর্বাগ্রে বিভিন্ন সিফাত ও গুণকেই মানুষের কাছে তুলে ধরার ওপর অধিক জোর দিয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পর্কে 'ইবাদত ও পারস্পরিক লেনদেনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। সকল আসমানী ধর্মেই 'ইবাদত ও আমল তথা আহ্কাম ও বিধিনিষেধ জারির পূর্বে মানুষের 'আকীদা ও বিশ্বাসের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। আল্লাহ্র প্রেরিত প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে 'ইলম ও মা'রিফাত তথা আল্লাহ্র বিভিন্ন সিফাত ও গুণাবলীর নির্ভুল শিক্ষাই দিয়েছেন সর্বপ্রথম। দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাঁদের সকল প্রচেষ্টা ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্র সর্বশেষ ও চিরন্তন পয়গাম আল্-কুরআনের প্রতিটি ছত্র এ কথার সত্যতার প্রমাণ বহন করছে। বিভিন্ন আঙ্গিকে ও পরিবর্তিত ভঙ্গিতে এই একই বিষয় বারবার উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে, বরং বলা চলে এটাই হচ্ছে আল্-কুরআনের বুনিয়াদী বিষয়। এ কারণেই আল্-কুরআনের সংক্ষিপ্ততম সূরা সূরাতুল-ইখ্লাসকে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা এ সূরায় মাত্র তিনটি আয়াতের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ্র একত্ব ও পবিত্রতা।

আল্-কুরআনের সর্বত্র আল্লাহ্ পাকের বিভিন্ন গুণাবলী, যথাঃ শক্তি ও কুদরত, করুণা ও রহমত, দয়া ও মুহব্বত, দান ও উদারতা, ক্ষমা ও অনুকম্পা, প্রতিপালন ও সৃষ্টি-কুশলতা, নৈকট্য ও সর্বব্যাপিতা, ক্ষমতা ও আধিপত্যের সুবিশালতা, বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে কৃতার্থ করা ইত্যাদি এমন সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, সকল সৌন্দর্য ও মহিমার, সকল পূর্ণতা ও কল্যাণের এক চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছে মানুষের সামনে। ফলে আপনাতেই সিজদাবনত হয়ে আসে তার গর্বিত শির এবং সে মহান সত্তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়ে তার 'কল্ব' পেতে চায় আত্মিক প্রশান্তি।

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۔ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

"আসমান ও যমীনে তাঁর মর্যাদাই সকলের ঊর্ধ্বে এবং তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, হিকমতের অধিকারী। [সূরা রূম ঃ ২৭]

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۔

"সত্যি তিনি অতুলনীয় এবং তিনিই সব কথা শোনেন, সব কিছু দেখেন।"

[সূরা শুরা ঃ ১১]

মানুষ বৈপরীত্যের আধার

সকল আসমানী কিতাব ও মাযহাব সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা ঘোষণা করেছে ... এবং স্বভাব ও মনস্তত্ত্ববিশারদগণও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, মানুষ বিভিন্ন বিপরীতধর্মী স্বভাব ও গুণের অধিকারী আল্লাহ্‌র এক অনন্য ও আশ্চর্য সৃষ্টি। তার সৃষ্টি উপাদানের মধ্যেই ঘটেছে বিভিন্ন বিপরীতমুখী অবস্থা ও গুণের এক অভিনব সমাবেশ। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্‌র এই বিশাল সৃষ্টি জগতে মানুষের চেয়ে আশ্চর্য, বৈপরীত্য ও জটিলতায় পরিপূর্ণ দ্বিতীয় কোন সৃষ্টি নেই। সে দুর্বল অথচ শক্তির পূজারী। এক ক্ষণস্থায়ী জীবনের সে অধিকারী অথচ সম্পদ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ অনন্ত জীবনের অভিলাষী। রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদে সে জর্জরিত, অথচ সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য প্রাণান্ত। ভীরু অথচ উচ্চাশায় আকাশের উচ্চতাকেও ডিঙিয়ে যেতে উদ্যত। চাহিদা ও প্রয়োজন তার বেশুমার। আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। বিলীয়মান বুদ্‌বুদের মতই নাযুক তার অনুভূতি। ভাব ও আবেগ সদা পরিবর্তনশীল। কখনও উচ্ছ্বসিত, কখনও বা স্তিমিত। কোন কিছুতেই সে তৃপ্ত নয়। পিপাসা তার অনন্ত । পুরাতনের প্রতি সে বিতৃষ্ণ। নতুনকে বরণ করে নিতে সদা উন্মুখ!

সহজেই যার নাগাল পাওয়া যায় তার প্রতি নেই তার সামান্যতম আগ্রহ, অথচ দুর্লভকে করায়ত্ত করার জন্য তার সে কী দুঃসাহসিক সংগ্রাম! স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তার শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদয়ের স্পন্দনের চেয়েও অধিক। চাহিদা ও প্রয়োজনের তালিকা জীবনের চেয়েও দীর্ঘ। পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একেবারেই অকিঞ্চিৎকর!

কিন্তু একথাও সত্য, মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের এই অনন্য বৈপরীত্ব, এই অনুপম উচ্চাশা মহাসত্যের সন্ধানে তার ব্যাকুল ও অধীর অনুসন্ধিৎসার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের মহাসম্মানে ভূষিত হওয়ার প্রকৃত রহস্য। বস্তুত এই অভিনব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সে আল্লাহ্‌র দেয়া 'আমানতের' মহাদায়িত্ব বহনে স্বীকৃত হয়েছে সানন্দে। অথচ এই বিশাল আকাশ, বিস্তৃত যমীন ও মেঘমালা ভেদকারী পাহাড়-পর্বত অনেক আগেই এই

কঠিন দায়িত্ব বহনে নিজেদের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে দিয়েছিল। কত সুন্দর ভাষায় আল্-কুরআন বর্ণনা করেছে মানুষের এই অনুপম দুর্বলতার কথা!

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً۔

"আসমান, যমীন, পাহাড়-পর্বত সবার কাছেই 'আমানত পেশ করলাম। সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জানিয়ে দিল নিজেদের অক্ষমতার কথা। কিন্তু মানুষ তা বহন করতে রাযী হয়ে গেল। সত্যি সে বড় জালিম, বড় জাহিল!"

[সূরা আযহাব ঃ ৭২]

মানুষের সহজাত প্রেম ধর্ম

আল্লাহ্ পাকের দেয়া যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়শক্তি মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে সেগুলো ছাড়াও আরো একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে দান করা হয়েছে। মাত্র দু'টি শব্দে মানুষের এই ষষ্ঠেন্দ্রিয়টি আমরা প্রকাশ করতে পারি। সে দু'টি শব্দ হচ্ছে 'প্রেম ও ভালোবাসা'। বস্তুত প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইশ্‌ক ও মুহব্বতের এই সুকুমার বৃত্তি মানুষের সৃষ্টি উপাদানের মধ্যেই গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এটা যেমন শক্তিশালী হতে পারে, তেমনি হতে পারে দুর্বল। কখনও হয় পূর্ণ বিকশিত ও সুরভিত, কখনও বা থাকে অনেক প্রলেপের আড়ালে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু মানব স্বভাবের এ মৌলিক উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে অথবা স্বভাব ও ফিতরত থেকে বিচ্যুত হয়ে শামিল হয়ে পড়েছে জড়বস্তুর কাতারে। চুম্বক যেমন আকর্ষণ করে কোন লৌহ খণ্ড, 'ইশ্‌ক ও প্রেমের এ দুর্বার শক্তি মানুষকে তেমনি আকর্ষণ করে যে কোন সুন্দর ও পূর্ণতরের প্রতি। দুনিয়ার অন্য কোন সৃষ্টিই সুন্দর ও পূর্ণতরের প্রতি এমন দুর্নিবার আকর্ষণবোধ করে না। আপন প্রেমাস্পদ ও কাঙ্ক্ষিতের জন্য মানুষ তার মন-প্রাণ, সুখ-শান্তি, সাধ-ইচ্ছা– এক কথায় নিজের সব কিছুই হাসি মুখে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে। 'আশিক ও প্রেমিকদলের বাস্তব ঘটনাবলী এরই উজ্জ্বল প্রতিফলন। আল্লাহ্‌র মা'রিফাত সাগরে ডুবন্ত মজনুদের গোটা ইতিহাস এরই বহিঃপ্রকাশ। বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সম্পদের একটা বিরাট অংশই মূলত মানুষের এই সুকুমার বৃত্তির সবুজ ফসল। পৃথিবীর কোন দেশ ও জাতির ইতিহাসই এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত নয়।

আত্মসমর্পণের সহজাত প্রেরণা

মানব হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত বিভিন্ন আবেগ ও অনুভূতি, স্পৃহা ও প্রেরণার মধ্যে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটা হলো, কোন উচ্চতর শক্তির কাছে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণের সহজাত প্রেরণা। নিজেকে একান্ত করে সঁপে দিয়ে ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে সিজদাবনত হয়ে সে পেতে চায় এক আত্মিক তৃপ্তি। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে মানবতার ক্রমবিকাশের সকল স্তরে এ সহজাত প্রেরণা তার সহচর ছিল। একটি মুহূর্তের জন্যও সে তা থেকে মুক্ত হতে পারেনি কোনদিন।

সৃষ্টির প্রথম পর্বে এর কিছু কিছু অবশিষ্ট আজো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দৃষ্টিগোচর হয়। সে পাথর ও গাছপালার সিজদা করেছে। প্রবহমান নদ-নদী ও শূন্য ভাসমান মেঘমালাকে প্রণাম করেছে। আবার কখনও পূজো করেছে প্রজ্জ্বলিত আগুনের, উজ্জ্বল সূর্যের, জ্যোৎস্না বিকিরণকারী চন্দ্রের, জ্যোতির্ময় তারকামালার কিংবা সৃষ্টি জগতের বিরাট বিরাট বস্তুর ও প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির। যে জিনিসকে সে জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বের ও রহস্যময় বলে মনে করেছে, তার সামনেই নত হওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এভাবেই সে তার সহজাত ভাব ও আবেগ তৃপ্ত করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য এতে তার ক্ষুধিত আত্মা কতটুকু খোরাক পেয়েছে, অতৃপ্ত কলবই বা পেয়েছে কতটুকু শান্তি সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

মানুষ আজ তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধন করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিস্ময়কর সাফল্য ও অগ্রগতিতে নিজেই সে অভিভূত। আত্মপূজায় সে নিমগ্ন। দম্ভ ও বাগাড়ম্বরের কোন শেষ নেই তার। টেস্টটিউব শিশুর পর এখন মৃত্যুজয়ের অলীক কল্পনায় বিভোর সে। বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহের মাধ্যমে একথাই সে প্রমাণ করতে চাইছে, কারো অধীনতা স্বীকার করতে সে রাযী নয়। কিন্তু এত কিছু করেও কি সে তার স্বভাবধর্ম ও সহজাত প্রেরণা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার সে দাবীদার, অথচ ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ, দলনেতা, রাষ্ট্রপ্রধান ও মানব মস্তিষ্কপ্রসূত দর্শন ও বাদ-মতবাদের অন্ধ পূজায় সে আদিম যুগের অসভ্য মানুষের মতই নিমগ্ন। আর্ট ও সংস্কৃতির দুনিয়ায় চোখ ধাঁধানো উন্নতির পাশাপাশি আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, লেখক, চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও বিরল প্রতিভা, মেধা ও ব্যক্তিত্বের

অধিকারী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সে প্রভাবিত আর এই প্রভাবিত হওয়ার পেছনে 'ইশ্‌ক্ ও মুহব্বত, শ্রদ্ধা নিবেদন ও নিজেকে সঁপে দেয়ার সেই একই শক্তি ক্রিয়াশীল যা ইতিহাসের কোন সুদূর অধ্যায়ে ছিল। মানব স্বভাবের এ রহস্যময় দিকটির ব্যাখ্যা শুধু এই হতে পারে যে, মানুষ একজন স্বভাবপ্রেমিক। প্রেমাস্পদ ও কাঙ্ক্ষিতের সামনে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েই সে আনন্দিত, পরিতৃপ্ত। এতেই সে খুঁজে পায় তার সৃষ্টি সার্থকতা। কেননা এটা তার স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সৃষ্টি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

আদর্শ সত্তার অপরিহার্যতা

ওপরের এই দীর্ঘ আলোচনার স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই, মানুষের জন্য এমন এক মহান ও পরিপূর্ণ আদর্শ সত্তার প্রয়োজন যিনি সকল সৌন্দর্য ও পূর্ণতার, সকল শক্তি ও ক্ষমতার একক উৎস। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে যাঁর অবস্থান। অসৌন্দর্য, অপূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা থেকে যিনি চিরপবিত্র। যিনি মানুষের সকল দাবী ও চাহিদা পূরণে, তার সহজাত প্রেরণ উচ্ছ্বাসকে শান্ত ও তৃপ্ত করতে সক্ষম। এই পূর্ণতম আদর্শ সত্তাকেই আল-কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে المثل الاعلى বা সর্বোত্তম মানদণ্ড।

মানুষ ও স্রষ্টার সম্পর্কের রূপ নির্ণয়

আল্লাহ্ পাকের বিভিন্ন গুণাবলীর যে অনুপম ও অলৌকিক ব্যাখ্যা আল্-কুরআন পেশ করেছে তা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করার পর আমরা যদি ভেবে দেখি মানুষের ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও নিঃস্বতার কথা, সেই সাথে যদি ভেবে দেখি তার সর্বজয়ী সাহস ও আকাশছোঁয়া উচ্চাশার কথা, যদি ভেবে দেখি দেহ ও আত্মার জগতে তার সীমাহীন ক্ষুধা ও অনন্ত পিপাসার কথা, যদি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেই রকমারিত্ব, সূক্ষ্ম রুচিবোধ, পরিপূর্ণতার প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সুদীর্ঘ তালিকার ওপর, সর্বোপরি যদি বিবেচনা করে দেখি 'ইশ্‌ক ও মুহব্বত, প্রেম ও ভালোবাসা এবং আত্মসমর্পণ ও নিজেকে একান্ত করে বিলিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তার সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততার কথা, তাহলে মুক্ত কণ্ঠেই একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে, নিজের প্রয়োজনেই মানুষের উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন মহান প্রতিপালকের 'ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যয় করা, সিজদাবনত অবস্থায় তাঁরই গুণ কীর্তনে সদা মশগুল থাকা। কেননা তিনি সকল দাতার বড় দাতা, সকল ক্ষমতাবানদের বড়

ক্ষমতাবান এবং তিনিই শুধু মেটাতে পারেন মানুষের দেহ ও আত্মার সকল চাহিদা ও প্রয়োজন – তা সে মুখে প্রকাশ করুক এবং লুকিয়ে রাখুক অন্তরের কোন গোপনতম স্থানে।

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۔ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۔

"তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রার্থিত সকল কিছু (তোমাদের উপযোগী করে) দান করেছেন। আর আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতসমূহ যদি তোমরা গুণতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।" [সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৪]

মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম ও সুপ্ত সকল অনুভূতির কথা তিনি জানেন, জানেন সুদূর অতীতের বিস্মৃত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার কথাও যা মানুষ নিজেই হয়ত ভুলে গেছে কিংবা নিরাশ হয়ে তা থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছে। এমন কি তিনি মানুষের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কেও খবর রাখেন, যেখানে হৃদয় বুদ্ধির অংশীদারিত্ব বরদাশত্ করতে রাযী নয়।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ

"আর মনে রেখো, আল্লাহ্ পাক মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে থাকেন।" [সূরা আনফাল ঃ ২৪]

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ۔

"তিনি চোখের গোপন চাহনিকে জানেন, জানেন মনের গহীন কোণে লুকিয়ে থাকা কথাকেও।" [সূরা মু'মিন ঃ ১৯]

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى ۔

"আর যদি তুমি উচ্চঃস্বরে কথা বল তবে তিনি তো চুপি চুপি বলা কথা, এমন কি আরো প্রচ্ছন্ন কথাও জানেন। [সূরা ত্বা-হা ঃ ৭]

সকল নিকটের নিকটতম তিনি। মানুষের নিঃশব্দ প্রার্থনাও তিনি শোনেন এবং সাড়া দিয়ে কৃতার্থ করেন।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۔

"আর যখন আমার বান্দাহ্ আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তবে আমি তো নিকটেই আছি। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা আমি কবুল করি যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। তাই মানুষের উচিত আমার বিধান মেনে নেয়া এবং আমার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। তবেই না তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"

[সূরা বাকারা ঃ ১৮৬]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

"আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তার হৃদয় পটে উদিত কল্পনার খবরও রাখি। আমি তো তার স্কন্ধ-শিরার চেয়েও বেশি নিকটে!"

[সূরা কাফ ঃ ১৬]

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّاتُبْصِرُوْنَ -

"আর আমি তোমাদের চেয়েও তার অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না। [সূরা ওয়াকি'আহ্ ঃ ৮৫]

অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁর ভালোবাসা ও রহমত এবং তাঁর করুণা ও সন্তুষ্টি শুধু তাদেরই জন্য যারা বিগলিত হৃদয়ে, অশ্রুপ্লাবিত চোখে, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে প্রার্থনা করে এবং সব দুয়ার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু তাঁরই দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে হাত পেতে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

"তোমাদের প্রতিপালক বলে দিয়েছেন, তোমরা আমাকে ডাক ; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। দাম্ভিকতার কারণে যারা আমার 'ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে যাবে।" [সূরা মু'মিন ঃ ৬০]

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

"তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা বিনয়-কাতর অবস্থায় এবং চুপি চুপি ডাক। সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ্ একটুও পছন্দ করেন না।" [আ'রাফ ঃ ৫৫]

আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূল ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে না তার ওপর তিনি অসন্তুষ্ট হন।"

[তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল আদ'ইয়াহ, হযরত আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত]

এ বিশ্বজগৎ 'ইবাদতে মশগুল

বৈচিত্র্যময় এ বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই আলো, তাপ ও জীবনের উৎস হিসাবে সূর্য তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে নিখুঁত নিরলসভাবে। পূর্ণিমা-অমাবস্যার লীলাময়ী চাঁদ তার সুনির্দিষ্ট পরিভ্রমণের মাধ্যমে নির্ধারণ করছে মাস-বর্ষ। কত বছর ধরে পাহাড় স্বস্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ্‌র নির্দেশে! শিকড় বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ। তার শীতল ছায়ায় বসে সুস্বাদু ফল খেয়ে উপকৃত হচ্ছে মানুষ। বাতাস নিয়োজিত আছে আশরাফুল মাখলূকাতের সার্বক্ষণিক সেবায়। মৃদু-মন্দ তালে বয়ে চলেছে সে মানুষের জন্য জীবনের বার্তা নিয়ে। শূন্যে ভাসমান মেঘমালা যখন যেখানে প্রয়োজন পানি বর্ষণ করছে, যে পানিতে মানুষ পিপাসা নিবারণ করছে, মৃতপ্রায় পৃথিবী সবুজের ছোঁয়ায় নতুন জীবন লাভ করছে। মাঠের পর মাঠ ভরে উঠছে সোনালী ফসলে। মানুষ তাতে উপকৃত হচ্ছে। আল্লাহ্‌র নির্দেশেই হয় এসব কিছু। বনেজঙ্গলে ও লোকালয়ে বিচরণ করছে চতুষ্পদ জন্তু ও সরীসৃপ প্রাণীকুল। গাছের ডালে আর নীল আকাশের শূন্যতায় উড়ছে পাখি। ওরাও মানুষের উপকার করে চলেছে বিভিন্নভাবে। এক কথায়, এই বিশাল সৃষ্টি জগতের কুল-মাখলুকাত অনবরত আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে চলেছে। তাঁরই 'ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল সকলে। কোথাও নেই কোন অবাধ্যতা ও হঠকারিতা। নেই বিদ্রোহ, ধর্মঘট অথবা কোন কর্মবিরতি। কোথাও নেই বিরক্তির সামান্যতম প্রকাশ। আদেশ পালন করে এবং সার্বক্ষণিক সিজদায় রত থেকেই যেন ওরা কৃতার্থ, অথচ মানুষ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকেই আল্লাহ্ 'আকল ও কলব' দান করেন নি।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ- وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ- اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ-

"তুমি কি দেখ না, আসমান যমীনের সব কিছুই (স্ব স্ব নিয়মে) আল্লাহ্‌কে সিজদা করছে এবং (সিজদা করছে) সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষের মধ্যেও একটা বিরাট সংখ্যা। আর অনেকের জন্য আমার 'আযাব নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ পাক যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেবার কেউ নেই"। [সূরা হাজ্জ ঃ ১৮]

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ . يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ -

"আসমান-যমীনে চলমান সকল বস্তুই আল্লাহ্‌র অনুগত এবং ফিরিশতারাও; এরা কেউ অহংকার করে না। তারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে যিনি তাদের ওপর ক্ষমতাবান এবং যে নির্দেশই দেয়া হয় তারা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে।" [সূরা নাহ্‌ল ঃ ৪৯-৫০]

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ -

"আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করছে আসমান-যমীনের সব কিছু ; কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর কেউ অনন্যোপায় হয়ে, এমন কি তাদের ছায়াও মাথা নত করছে সকাল-সন্ধ্যায়।" [সূর রা'দ ঃ ১৫]

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَّ النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ -

"চন্দ্র ও সূর্য নিয়ন্ত্রণের অধীন। তারকারাজি ও গাছপালা উভয়েই আল্লাহ্‌র অনুগত।" [সূরা আর রহমান ঃ ৬]

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاٰئِبَيْنِ - وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - وَاٰتٰكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

"আল্লাহ্ এমন যিনি আসমানের স্তরসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। সেই পানি থেকে তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে ফল উৎপন্ন করেছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌযানগুলোকে (আপন কুদরতের) বশীভূত করেছেন যেন সেগুলো সমুদ্রে চলতে পারে এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য নদী-নালাকে (আপন কুদরতের) বশীভূত করেছেন। তোমাদের মঙ্গলের জন্য চন্দ্র-সূর্যকে (আপন কুদরতের) বশীভূত করেছেন যা অনবরত পরিভ্রমণরত (আপন কক্ষপথে) আর তোমাদের মঙ্গলের জন্য রাত্র ও দিনকে আপন কুদরতে বশীভূত করেছেন। আর তোমাদেরকে তোমাদের প্রার্থিত সব কিছুই তোমাদের উপযোগী করে দান করেছেন। তোমরা যদি আল্লাহ্ পাকের নিয়ামত গুণতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড় অবিচারী, বড় অকৃতজ্ঞ।" [সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩২-৩৪]

এ বিশ্ব জগতের ছোট-বড় সব সৃষ্টিই রূপ, আকৃতি ও গঠন প্রকৃতির পার্থক্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও এমন এক সালাত ও হাম্দ-তাসবীহ্তে সদা মশগুল রয়েছে যা তাদের সৃষ্টিগত দায়িত্ব ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সৃষ্টিকুলের এই হাম্দ ও সালাত অনুধাবন করা এমন ব্যক্তির পক্ষেই শুধু সম্ভব যাকে আল্লাহ্ পাক অন্তর্চক্ষু দান করেছেন। জড়জগতের স্থূল পর্দা যার চোখ থেকে সরে গিয়েছে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ـ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ

"তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছে সাত আসমান ও যমীন এবং যা কিছু তার মধ্যে রয়েছে। এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছে না। অবশ্য তোমরা তাদের এ 'তাসবীহ' বুঝতে পার না। তিনি বড় সহনশীল ও পরম ক্ষমাশীল।" [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ـ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ـ

"তুমি কি জান না, আসমান ও যমীনের সব কিছু এবং পাখা বিস্তার করে উড়ন্ত পাখীর দলও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছে ? ওদের প্রত্যেকেরই জানা আছে নিজ নিজ 'দু'আ ও তাসবীহ'– আর এসব লোক যা করছে আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন।" [সূরা নূর ঃ ৪১]

সৃষ্টি জগতে মানুষের স্থান ও বৈশিষ্ট্য

মানুষ সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টি জগতের কুল মাখলুকাত নিয়োজিত তারই সেবায়। একমাত্র মানুষকেই আল্লাহ্ পাক আকল ও কলবের নিয়ামত দান করেছেন। মুষলধারে বৃষ্টির মত প্রতিনিয়িত তার ওপর বর্ষিত হচ্ছে আল্লাহ্‌র অসংখ্য করুণা। এমন সব পুরস্কার তার জন্য অপেক্ষা করছে যা কেউ কোনদিন দেখেনি শোনেনি, এমন কি কল্পনাও করেনি।

এই অফুরন্ত নিয়ামত ও অকল্পনীয় পুরস্কারের স্বাভাবিক দাবি এই, কৃতজ্ঞ চিত্তে ও বিনয়াবনত মস্তকে মানুষ সর্বক্ষণ মশগুল থাকবে আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ব্যয় হবে রুকু'-সিজদা, হাম্‌দ-তাসবীহ ও আল্লাহ্‌র স্মরণে। এক লমহার জন্যও গাফিল হবে না সে, বরং ইবাদত ও হাম্‌দ-সালাতের সার্বক্ষণিকতায় মাটির মানুষ ছাড়িয়ে যাবে নূরের ফিরিশতাকেও যাঁদের সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ - يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ -

"আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধীন। আর যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করে না এবং ক্লান্তও হয় না। (বরং) দিনরাত অনবরত তাসবীহ্ পাঠে তারা রত থাকে।"

[সূরা আম্বিয়া ঃ ১৯-২০]

কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, মানুষ আল্লাহ্ পাকের খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র খিলাফত কায়েমের মহান ও গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে। এই সৃষ্টিগত দায়িত্বের সাথে সঙ্গতি রেখেই তার মধ্যে ঘটানো হয়েছে বিভিন্ন রকম অভিলাষ ও স্পৃহা এবং চাহিদা ও প্রয়োজনের বিচিত্র সমাবেশ! তার মধ্যে যেমন আছে ভাব ও আবেগের উত্তাল-তরঙ্গ, তেমনি আছে ইশ্‌ক ও প্রেমের সুতীব্র দহন। আছে সুখ-দুঃখের অনুভূতি, মিলনের তৃপ্তি ও বিরহের বেদনাবোধ। আছে জ্ঞান-সাগর মন্থন করার অনন্ত পিপাসা এবং

অজানাকে জানার গভীর অনুসন্ধিৎসা। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে লুক্কায়িত ও প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত অফুরন্ত সম্পদ আহরণ করার এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তাকে দান করা হয়েছে সৃষ্টি লগ্নেই। ফিরিশতাদের সভায় নাম বিবৃত করার যে বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য সে অর্জন করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা তার স্বভাবগত যোগ্যতারই প্রতীক এবং আল্লাহ্‌র খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের প্রথম প্রকাশ। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ - قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ -

"যখন আপনার প্রভু বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি, তখন তারা বলল, আপনি কি এমন এক জাতি সেখানে পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে? রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ বলেন ঃ আমি জানি যা তোমরা জানো না। এবং আল্লাহ্ আদমকে সমস্ত নাম শিখালেন। অতঃপর সেগুলো ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমাকে এ জিনিসগুলোর নাম তোমরা বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তখন তারা বলল ঃ আপনি অতি পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন 'ইল্‌ম নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান। তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে ঐ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও। যখন আদম তাদেরকে সব জিনিসের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাদের কি বলিনি, আমি জানি আসমান-যমীনের রহস্যঘেরা বিষয় আর আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা লুকিয়ে রাখ।" [সূরা বাকারা ঃ ৩০–৩৩]

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

"তিনি তো তোমাদের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা বাকারা ঃ ২৯]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ -

আপনি বলে দিন, কে সে যে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র তৈরী সৌন্দর্যাবরণ ও হালাল খাদ্যদ্রব্যসমূহ হারাম করেছেন? [সূরা আ'রাফ ঃ ৩২]

এই কঠিন ও গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যই মানুষের সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র এই বিশেষ মকসূদ পূর্ণ করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অতএব, স্বাভাবিক কারণেই মানুষের পক্ষে সৌরজগত, প্রাণী-জগত ও জড়-জগতের সৃষ্টিকুলের ন্যায় একটানা কিয়াম ও রুকূ-সিজদা এবং সার্বক্ষণিক 'ইবাদত ও যিকিরে মশগুল থাকা সম্ভব নয় কিছুতেই; বরং এমন হাস্যকর চেষ্টা যদি কখনও সে করে তবে যমীনের বুকে খলীফাতুল্লাহ্ হিসেবে তার অযোগ্যতাই শুধু প্রকাশ পাবে। প্রমাণিত হবে ফিরিশতাকুলের মন্তব্যের যথার্থতা। সার্বক্ষণিক 'ইবাদত ও হামদ্-তাসবীহে মশগুল থাকার ভিত্তিতেই তো খিলাফতের প্রশ্নে নিজেদেরকে তারা মানুষের চেয়ে যোগ্য বলে ধারণা করেছিল!

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ -

"আমরাই তো সর্বক্ষণ আপনার হামদ-তাসবীহ ও পবিত্র বর্ণনায় মগ্ন আছি।" [সূরা বাকারা ঃ ২৯]

মানুষের উপযোগী 'ইবাদত পদ্ধতি

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল মানুষের জন্য এমন এক 'ইবাদত পদ্ধতির প্রয়োজন যা তার স্বভাব ও ফিতরাতের পূর্ণ উপযোগী এবং সৃষ্টিকুলের মাঝে তার অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বোপরি তার সৃষ্টি উদ্দেশ্য তথা খিলাফতের মহাদায়িত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ। একদিকে 'ইবাদত তার এক অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন। কেননা এটা তার স্বভাব ও ফিতরাতের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি, হৃদয় ও বুদ্ধির আবেদন, মহত্ত্ব ও কৃতজ্ঞবোধের চরম প্রকাশ, আত্মা ও কলবের খোরাক। এক কথায় 'ইবাদতই হচ্ছে তার জন্ম লাভের

সার্থকতা। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য সত্য, এই 'ইবাদত পদ্ধতি তার দেহসত্তার উপযোগী এবং সৃষ্টিগত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে অবশ্যই। সে 'ইবাদত হবে এমন এক পোশাকের মত যা মানবদেহে খাপ খেয়ে যাবে সুন্দরভাবে। এমন এক নিখুঁত পোশাকের মত যা দেহ থেকে বড় নয়, ছোটও নয়। সংকুচিত নয়, ঢোলাও নয়। বলা বাহুল্য, 'সালাত' বা নামাযই হচ্ছে সেই পোশাক যা স্রষ্টা স্বয়ং মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

"তিনিই কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন? অথচ তিনিই একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।" [সূরা মূলক ঃ ১৪]

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ -

"প্রতিটি বস্তুকেই আমি এক নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছি।"

[সূরা কামার ঃ ৪৯]

সালাতের সংখ্যা হ্রাসের হিকমত ও মনস্তাত্ত্বিক সুফল

সালাতের বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত এক উচ্চতম উত্তরণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সুকোমলভাবে এগিয়ে যাওয়ার অনুপম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। পবিত্র মি'রাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আমাদের নবীজী (সা.)-কে তাঁর উম্মতের জন্য উপহার দেয়া হয়। কিন্তু পরে নবী করীম (সা.)-এর প্রার্থনার প্রেক্ষিতে তা শিথিল করে পাঁচ ওয়াক্তে নামিয়ে আনা হয়। এই হিকমতপূর্ণ পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক সুফল এই, মানুষের মনে একথা সদা জাগরূক থাকবে, পঞ্চাশ ওয়াক্তই হচ্ছে ফরয সালাতের প্রকৃত সংখ্যা। অর্থাৎ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময়, শক্তি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য দিয়েই আল্লাহ্ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ ধারণা ও বিশ্বাস যার অন্তরে জাগরূক থাকবে, মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা তার পক্ষে মোটেই কোন কঠিন ও কষ্টকর কাজ বলে মনে হবে না, বরং সে মনে করবে আমাকে তো আরো অধিক সংখ্যক সালাতের যোগ্য মনে করা হয়েছিল। পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাক যদি তাঁর পূর্ব নির্দেশ শিথিল না করতেন তবে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতই আমাকে আদায় করতে হতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর দুর্বল

বান্দাদের ওপর দয়া ও করুণার চরম প্রকাশ ঘটিছেন এবং পাঁচ ওয়াক্তকেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন। তবু মানুষের মনোবলকে আরো সবল, উৎসাহকে আরো উজ্জীবিত করে তোলার ক্ষেত্রে মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্ পাকের সেই নির্দেশটির সুগভীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

আল-কুরআনে এর দৃষ্টান্ত

উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে আল-কুরআন থেকে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে।

জিহাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি প্রথমে আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল, সংখ্যায় ও শক্তিতে নিজেদের চেয়ে দশ গুণ শত্রুর মুকাবিলায়ও তাদেরকে দৃঢ় থাকতে হবে, পিছপা হওয়া চলবে না কোন যুক্তিতেই। কিন্তু পরে পূর্বোক্ত নির্দেশ শিথিল করে নতুন নির্দেশ দেয়া হলো। এখন থেকে সংখ্যায় ও শক্তিতে দ্বিগুণ শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল থেকে বিজয়ী হবে। আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مَائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّاَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ـ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّاَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

"হে নবী! মু'মিনদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করুন (এবং বলুন), তোমাদের বিশ জন যদি স্থির ও অবিচল থাকে তবে দু'শ জনের মুকাবিলায় তারা বিজয়ী হতে পারবে। আর এক শ'জন এক হাজারের মুকাবিলায় বিজয়ী হতে পারবে। কেননা ওরা সত্য ধর্মের বলে বলীয়ান। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য শিথিল করে দিয়েছেন এবং তিনি এটা জেনেছেন, তোমাদের মধ্যে সাহস ও মনোবলের অভাব রয়েছে। অতএব, যদি তোমাদের এক শ'জন স্থির ও সুদৃঢ় থাকে তবে দু'শ জনের মুকাবিলায় তারা বিজয়ী হতে পারবে। আর এক হাজার বিজয়ী হতে পারবে দু'হাজারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র ইচ্ছায়। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা আনফাল ঃ ৬৫–৬৬]

কিন্তু এই শিথিলতা সত্ত্বেও প্রথম নির্দেশটির ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি কখনো, বরং যুগে যুগে তা মুসলমানদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা, ত্যাগের প্রেরণা ও শাহাদাতের উন্মাদনা সৃষ্টিতে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই বলে বলীয়ান হয়ে তারা জানবাজি রেখে, মাথায় কাফন বেঁধে, মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে কোন বিপদের মুখে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে গিয়ে শত্রুর সংখ্যাধিক্য কিংবা অস্ত্রবল কোনদিনই প্রভাবিত করতে পারেনি তাদেরকে।

উল্লিখিত আয়াতের হুকুম মানসূখ (রহিত) হওয়া সত্ত্বেও তিলাওয়াত মানসূখ না হওয়ার হিকমত ও তাৎপর্য সম্ভবত এই, যখনই মুসলমানদের শক্তি ও সাহসে ভাটা পড়বে তখনই এই আয়াত তাদের মধ্যে বীরত্ব ও সাহসিকতার এক সৃষ্টিধর্মী ঝড় বইয়ে দেবে; পাগল করে তুলবে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রেরণায়, শাহাদাত ও মৃত্যুর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায়। যুগে যুগে সাচ্চা মুসলমান ও কাফনধারী মর্দে মুজাহিদদের এ-ই ছিল বৈশিষ্ট্য।

সালাত এক আধ্যাত্মিক খোরাক

প্রতিটি সালাতের জন্যই আল্লাহ্ পাক সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ـ

"নিশ্চয়ই সালাত মু'মিনদের ওপর সময়সহ ফরয করা হয়েছে।"

[সূরা নিসা ঃ ১০৩]

অতএব, নির্ধারিত সময় মতেই আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে। সালাতের সময়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

"সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত আঁধার হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করুন, আর ভোরের সালাতও। নিশ্চয় ফজরের সালাত (ফিরিশতাদের) উপস্থিতির সময়।"

[সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮]

তাফসীরবিশারদগণ উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত (دلوك) শব্দ দ্বারা জোহর, 'আসর, মাগরিব ও (غسق الليل) শব্দ দ্বারা এ'শার সালাত ও (قران الفجر) শব্দ দ্বারা ফজরের সালাতের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাদীস শরীফেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের দ্বিতীয় আয়াতটি এই ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ـ

"আপন প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠে রত থাকুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং দিনের শুরু ও শেষে তাসবীহ পাঠ করুন যেন আপনি সুখী হন। [সূরা তা-হা ঃ ১৩০]

অতএব নির্ধারিত সময়েই আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে। সময়ের মত সালাতের রাক'আত সংখ্যাও আল্লাহ্ পাক নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা অবশ্যই পালনীয়। কোন অজুহাতেই এর অন্যথা হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবাগণ সালাতের সময় ও রাক'আত সংখ্যা উভয়েরই যথাযথ পাবন্দী করেছেন জীবনভর, এমন কি জিহাদ ও যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এ ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা তাঁরা প্রদর্শন করেন নি। ইসলামী উম্মাহ্ সালাতের এই 'ইবাদত এমন নিষ্ঠা, যত্ন, ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতার সাথে পালন করে এসেছে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে। উত্থান-পতনের অনেক নাযুক মুহূর্তই এসেছে ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, এসেছে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার মুহূর্ত। কতবার অন্ধকারে ছেয়ে গেছে গোটা জাতির ভাগ্যাকাশে। কিন্তু কোথাও কোন দুযোর্গপূর্ণ পরিস্থিতিতেই এক ওয়াক্তের জন্যও মুলতবি হয়নি আল্লাহ্ পাকের উপহৃত এই সালাত।

বস্তুতপক্ষে এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত সময় ও রাকাআত সংখ্যাসহ মানুষের রূহ ও আত্মার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য রক্ষাকারী ইনজেক্শনস্বরূপ। আর স্বয়ং রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন এ ব্যবস্থাপত্র যিনি মহাজ্ঞানী ও অনন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী, মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের যাবতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে যিনি মানুষের চেয়েও বেশী অবগত। তাই মানুষের উচিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর বিধান মেনে নেয়া এবং অবনত মস্তকে তাঁর নির্দেশ পালন করে যাওয়া।

বস্তুত সালাতের সময়সমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সে সময়গুলোতে আল্লাহ্‌র অপার রহমত ও করুণার যে বারিধারা বর্ষিত হয়, জ্যোতির্ময় তাজাল্লী ও নূরের স্নিগ্ধ পরশে আত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের এবং নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জনের যে অনুপম অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তার যথার্থ 'ইল্‌ম' আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল ব্যতীত আর কারো নেই। তবে এই পাঁচটি সময় নির্ধারণের অনেক কারণ ও হিকমতের একটি হলো এ সময়গুলোতে মুশরিকগণ তাদের উপাস্য দেব-দেবতার পূজা করত। তাই মুসলমানদেরকে সে সময়গুলোতে লা-শারীক আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে মশগুল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মানুষ যেখানে একজন ডাক্তার ও চিকিৎসকের পরামর্শ, ব্যবস্থাপত্র, ওষুধের মাত্রা ও পথ্য মেনে চলা অত্যাবশ্যক মনে করে এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম শিথিলতা প্রদর্শন কিংবা নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রয়োগকে অমার্জনীয় অপরাধরূপে বিবেচনা করে, অথচ চিকিৎসক ভিন্ন গ্রহের অতি বুদ্ধিমান কোন জীব নয়, আমাদেরই মত রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ যার অভিজ্ঞতা সীমিত, জ্ঞান অনুমাননির্ভর। সে ক্ষেত্রে মহাজ্ঞানী ও অনন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ হওয়া উচিত যিনি বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক? এবং যার শান হলো এই ঃ

اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -

"তিনিই আমাদের রব যিনি সকল বস্তুকে তার যথাযথ আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।" [সূরা ত্বা-হা ঃ ৫০]

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

"তিনিই কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনিই একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।" [সূরা মূলক ঃ ১৪]

সালাতের প্রাত্যহিকতার হিকমত

সময়ের অল্প অল্প ব্যবধানে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করার পেছনে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্ পাকের বিরাট হিকমত। সালাতের এই বারংবারতা ও প্রাত্যহিকতার মাধ্যমে মানুষ তার আত্মা ও রূহের জন্য লাভ করে পরিপূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্য। অদ্রূপ এতে রয়েছে 'কলব'কে সৃষ্টিবিমুখ ও স্রষ্টামুখী করে পার্থিব লোভ-লালসা ও শয়তানের চতুর্মুখী প্ররোচনা থেকে হিফাজতের পরিপূর্ণ ও

কার্যকর ব্যবস্থা। এ প্রসংগে হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ দেহলবী (র.) বড় সুন্দর লিখেছেন ঃ

"মুসলিম উম্মাহ্ যদি প্রতিদিন বারবার 'জীবন ও কর্মের হিসাব ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত না রাখে তবে এই উম্মাহ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো কিছুতেই সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান প্রদানের মাধ্যমে মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্ পাক সে ব্যবস্থাই করেছেন। পূর্ব থেকেই সালাতের অপেক্ষা ও প্রস্তুতি গ্রহণ মূলত সালাতেরই অন্তর্গত এবং সালাতের জ্যোতির্ময়তারই একটা অংশ। এভাবে দিনের অধিকাংশ সময়ই সালাতের গণ্ডিতে এসে পড়ে। আমাদের এ অভিজ্ঞতা আছে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ সালাতের নিয়ত করে শয্যা গ্রহণ করে সে অন্ততপক্ষে পশুর মতো নিশ্চিন্ত ঘুম কিছুতেই ঘুমোতে পারবে না। তদ্রূপ কারো অন্তর যদি সর্বদা সালাত ও অন্যান্য যিকির ও ইবাদতের চিন্তায় মগ্ন থাকে তবে তার ভেতরের পশুত্ব কিছুতেই তাকে কোন পাশবিক কর্মে লিপ্ত করতে সফল হবে না। مـن تعـا رض الليـل হাদীসটির মর্মও তাই।[১]

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ-

"এরা এমন লোক যাদেরকে ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয় কিছুই আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফিল করতে পারে না।" [সূরা নূর ঃ ৩৭]

ইসলামে সালাতের গুরুত্ব

আহকামে ইলাহী তথা আল্লাহ্র বিধানের এই হিকমত ও প্রজ্ঞার সামনে আমাদের সকলকেই মাথা ঝুঁকিয়ে দেওয়া উচিত। এ অবিচল বিশ্বাস আমাদের

---

১. .এখানে বুখারী, তিরমিযী ও আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে হাদীসটি এই ঃ
"ঘুম থেকে জাগ্রত হতে হতে যার মুখে কলেমা শাহাদাত, তাসবীহ্ ও তাহমীদ তথা পবিত্রতা ও প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হয় সে যদি কোন দু'আ করে কিংবা ওযু করে সালাত আদায় করে তবে তার দু'আ ও সালাত অবশ্যই কবুল হবে।"
হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র.) উপরিউক্ত হাদীসের এই মর্ম উদ্ধার করেছেন যার মুখে আল্লাহ্র যিকির এতই স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তরে সালাতের চিন্তা এতই প্রবল, চোখ খোলার সাথে সাথে মুখ থেকে যিকির শুরু হয়ে যায় সে কিছুতেই গাফিল ও অচৈতন্য অবস্থায় ঘুমাতে পারবে না।
[হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ, খ. ১, পৃ-৭৮]

থাকতে হবে যে, সালাত হলো বান্দার জন্য প্রেরিত আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠ উপহার, প্রধানত ফরয, দীনের অন্যতম মূল স্তম্ভ, অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী, নাজাত ও মুক্তির পূর্বশর্ত, ঈমানের অতন্দ্র প্রহরী।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَاتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

"তোমরা সালাত কায়েম কর আর মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না।"

[সূরা রূম ঃ ৩১]

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

"যদি ওরা তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।" [সূরা তাওবা ঃ ৫]

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ -

"যদি তারা তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের ভাই। [সূরা তওবা ঃ ১১]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, সালাতই হচ্ছে বান্দা ও কুফরের মাঝে অন্তরায়।

সর্বোপরি এই 'সালাত'কে আল্লাহ্ পাক হিদায়াত ও তাকওয়ার বুনিয়াদী শর্তরূপে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

"এ মহাগ্রন্থ এমন, যেখানে দ্বিধা-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। মুত্তাকীন তথা আল্লাহ্ভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ; যারা গায়েব ও অদৃশ্যের ওপর ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।" [সূরা বাকারা ঃ ১-৩]

قَدْاَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

"সফল ব্যক্তি সেই, যে পবিত্রতা অর্জন করেছে। আর আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণে ও সালাতে মগ্ন থেকেছে।" [সূরা 'আলা ঃ ১৪-১৫]

গর্হিত কাজে লিপ্ত ও হীন চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর আযাবের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সালাতের প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ -

"অবশ্য মুসল্লীগণ (এর অন্তর্গত নয়) যারা সদা সালাতে রত থাকে।"

[সূরা মা'আরিজ ঃ ৩৪]

সফলকাম মুসলমানদের চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ -

"আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ পাবন্দির সাথে আদায় করে।

[সূরা মু'মীনুন ঃ ৯]

জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্তদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ -

"কি অপরাধে তোমাদের জাহান্নামে টেনে আনা হলো? তারা উত্তরে বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" [সূরা মুদ্দাছছির ঃ ৪২-৪৩]

মুনাফিকদের প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا -

"নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে চালবাজি করছে, অথচ আল্লাহ্ তাদের চালবাজির প্রতিদান দেবেন। এরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন অত্যন্ত অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। লোক দেখানোই সার। খুব কমই এরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।"

[সূরা নিসা ঃ ১৪২]

সওম , হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির নির্দেশ বিভিন্ন পূর্বশর্ত ও অবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। সে সব 'ইবাদতের সময়ও নির্দিষ্ট ও সীমিত। কিন্তু সালাত এমনই এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত 'ইবাদত যা সব সময় ও সব অবস্থায় ফরয। আমীর-গরীব, গোলাম-মুনিব, সুস্থ-রোগী ও মুকীম-মুসাফির –এক কথায় কোন

পূর্ণবয়স্ক মানুষই এ নির্দেশের ব্যতিক্রম নয়, এমন কি যুদ্ধের মাঠে তোপ-কামানের অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের মুখেও সালাতের ফরয বিধান অবশ্য পালনীয়। ইসলামী ফিকাহ্‌শাস্ত্রের পরিভাষায় এ বিশেষ সালাতের নাম দেয়া হয়েছে 'সালাতু'ল-খাওফ' বা 'ত্রাসকালীন সালাত'।

আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ ـ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ـ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ـ

"আর যখন তোমরা যমীন সফর কর তখন সালাতের রাক'আত সংখ্যা কমানোতে (কসর' পড়াতে) কোন ক্ষতি নেই, যদি তোমরা এমন আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিঃসন্দেহে কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন এবং তাদের জন্য সালাত কায়েম করেন তখন এরূপ করা উচিত যে, তাদের মধ্য থেকে এক জামা'আত আপনার সাথে সালাতে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র তারা নিজেদের সাথেই রাখবে। সিজদার পর তারা আপনাদের পেছনে চলে যাবে এবং অন্য

দলটি যারা এখনও সালাত পড়েনি, এসে দাঁড়াবে এবং আপনার সাথে সালাত আদায় করবে। এরাও নিজেদের আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের সাথে রাখবে। কাফিররা তো এই চায়, আপনারা নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যসম্ভার থেকে অসতর্ক হয়ে পড়েন, যেন অমনি তারা একযোগে আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা তোমরা পীড়িত থাকো তখন অবশ্য নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখতে ক্ষতি নেই। তবু নিজেদের আত্মরক্ষার সামান অবশ্যই সাথে রাখবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি তৈরি রেখেছেন। অতঃপর তোমরা যখন সালাত আদায় থেকে ফারেগ হলে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন হয়ে যাও। এরপর যখন তোমরা বিপদ ও শঙ্কামুক্ত হয়ে যাও তখন যথানিয়মে সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সহ ফরয হয়েছে।"

[সূরা নিসা ঃ ১০১-২০৩]

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ـ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَاناً فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ـ

"তোমরা সব সালাত বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের হিফাজত কর এবং আল্লাহ্র সামনে বিনয়াবনত অবস্থায় দাঁড়াও। আর যদি তোমরা কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা বোধ কর তবে দাঁড়ানো অবস্থায় কিংবা আরোহন করা অবস্থায় আদায় করে নাও। আবার যখন শংকামুক্ত হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্র স্মরণ সেভাবেই কর যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"

[সূরা বাকারা ঃ ২৩৮–২৩৯]

সালাত তরক করার পরিণাম

সালাত এমনই এক অপরিহার্য ফরয যা কোন ওলী-বুযূর্গ এমন কি নবী-রাসূলদের জন্যও রহিত হতে পারে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ

"মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপন প্রতিপালকের ইবাদতে রত থাকুন।"

[সূরা হিজর ঃ ৯৯]

এখন কোন অর্বাচীন যদি মনে করে, মুজাহাদা ও সাধনা বলে এমন এক স্তরে সে উপনীত হয়েছে যেখানে সালাতের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই কিংবা আল্লাহ্‌র দীনের পথে বিশেষ কুরবানী ও অবদানের কারণে সালাতের নির্দেশ তার জন্য মওকুফ হয়ে গেছে, তবে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে ধ্বংসের চোরাবালিতে সে পা দিয়েছে।

কৃতিত্বপূর্ণ কর্ম ও অবদান কিংবা বিশেষ কোন অবস্থা ও হালতের ওপর ভরসা করে সালাত তরককারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সেই পণ্ডিত ভদ্রলোকের মত যিনি নৌকায় চড়ে মাঝ দরিয়ায় এসে হঠাৎ ভাবতে শুরু করলেন, এই লৌহখণ্ডটির কি প্রয়োজন? এটা ছাড়াও তো স্বচ্ছন্দে নৌকা বয়ে যেতে পারে। বুদ্ধির অহমিকায় অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই তিনি লৌহখণ্ডটি খুলে ফেলে দিলেন। দেখা গেল, নৌকায় পানি উঠতে শুরু করেছে। অনধিকার চর্চা ও অন্যায় হস্তক্ষেপের পরিণতিতে নিশ্চিত ধ্বংস উপস্থিত হয়েছে!

আরো একটি উদাহরণ

সালাতের মধ্যেই দীন ও ঈমানের হিফাজত, আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্কের স্থিতি, ইসলামের গণ্ডিতে ও মুসলমানদের কাতারে শামিল থাকার রহস্য নিহিত রয়েছে। এটা কেমন করে হলো? একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন এর হাকীকত।

সুপ্রসিদ্ধ আরিফ ও বুযূর্গ হযরত মাখদুম শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র.) এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি বড় শিক্ষণীয় উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

'এর উদাহরণ এরূপ মনে কর, এক ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় প্রাসাদ তৈরী করল। রকম বেরকমের নিয়ামত ও বিলাসসামগ্রীর সমাবেশ ঘটাল। কিন্তু আল্লাহ্‌র অমোঘ-বিধান অনুযায়ী একদিন তার জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকল। সেদিন সে তার একমাত্র পুত্রকে কাছে ডেকে বললঃ তুমি যখন যেমন ইচ্ছে এ প্রাসাদের সংস্কার সাধন করতে পার। কিন্তু প্রাসাদের কোণে যে ফুলগাছটি দেখতে পাচ্ছ তা কোন অবস্থাতেই উপড়ে ফেলে দিও না।

কিছুদিন পর বসন্তের আগমনে পাহাড়ের চূড়া যখন সবুজ সজীব হয়ে উঠল নতুন লাগানো চারা গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেল আর সে ফুলের খোশবুতে গোটা প্রাসাদ হলো সুরভিত; ছেলেটির কাছে তখন পিতার হাতে লাগানো

কোণের সেই গাছটি একান্তই বেমানান ঠেকল। সে ভাবল, ফুলের সুগন্ধির জন্যেই তো আমার পিতা প্রাসাদের বাগানে গাছটি রোপণ করেছিলেন, কিন্তু এক শুকনো গাছ এখন আর কি কাজে আসবে? এ গাছে তো আর কোন ফুলের মেলা বসবে না। তাই সে বাগানের মালীকে গাছটি উপড়ে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিল। একদিন এক কাল সাপ ফণা তুলে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল এবং ছেলেটির গায়ে মরণ ছোবল হানল। সাথে সাথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আসলে গাছটি ছিল সর্প-বিষনাশক। ফলে প্রাসাদের আশেপাশে কোন বিষাক্ত সাপই ঘেঁষতে পারত না। কিন্তু ছেলেটির তা জানা ছিল না। নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির ওপর তার ছিল দারুণ অহমিকা। সে মনে করত, যা সে জানে না তার অস্তিত্বই বুঝি নেই আল্লাহ্‌র বিশাল কুদরতের ভাণ্ডারে। "অতি অল্প জ্ঞানই তোমাদেরকে দান করা হয়েছে।" ফলে জ্ঞান ও বুদ্ধির অহমিকাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। [তারীখে দাওয়াতে ওয়া আযীমত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩০৬]

সালাত তরককারীর অবস্থাও এরূপ। কেউ যদি মনে করে, সালাতের প্রয়োজনীয়তা তার জন্য ফুরিয়ে গেছে, কেননা যে সকল মহৎ উদ্দেশ্যে সালাতের বিধান নাযিল হয়েছে তা সে ইতিপূর্বেই হাসিল করে ফেলেছে। কিংবা কেউ যদি ইবাদত, অধ্যাত্ম সাধনা, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, কুরবানী, ইসলামী আন্দোলনের কর্মযজ্ঞে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার সুবাদে সালাতকে নিষ্প্রয়োজন ভেবে আল্লাহ্‌র এ মহান বিধানের প্রতি অনীহা ও গাফিলতি প্রদর্শন শুরু করে, তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হবে, এক মর্মান্তিক পরিণতির মুখে এনে নিজেকে সে উপনীত করেছে। নিজের হাতেই সম্পন্ন করেছে সে নিজের ধ্বংসের সকল আয়োজন। তার অতীতের ত্যাগ, কুরবানী, ইবাদত ও আমল শুধু বৃথাই যাবে না, বরং সেগুলোই এখন তার জন্য বাস্তব অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তার অবস্থা হবে সেই মেষ শাবকের মত, রাখালের চোখ ফাঁকি দিয়ে যে শাবক দূরে কোথাও একা একা চরে বেড়াচ্ছে। অথচ সে জানে না, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নেকড়ের লোলুপ দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করছে, জিহ্বা থেকে টপ টপ করে লালা ঝরছে।

মাছের জন্য পানি মুমিনের জন্য সালাত

সালাত প্রকৃত পক্ষে মানুষের সহজাত দুর্বলতা, অক্ষমতা, ক্ষুদ্রতা ও নিঃস্বতারই পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত প্রকাশ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সিফাত ও গুণাবীলর সামনে নিজেকে ফানা ও বিলীন করে দেয়াই হচ্ছে মানুষের আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত

দাবী। সৃষ্টি জগতের সকল শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা, লা-শরীক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর অফুরন্ত করুণা ও রহমতের ওপর নিশ্চিত ভরসা করা এবং সকল দুয়ার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু তাঁর দুয়ারে মাথা ঝুঁকিয়ে পড়ে থাকার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় তার সৃষ্টি লাভের সার্থকতা। মানুষের আত্মার এই শাশ্বত চাহিদা মেটানোর জন্যই আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম রহমতের প্রমাণস্বরূপ সালাতের বিধান পাঠিয়েছেন। বস্তুত সালাতের মধ্যে মানুষের সহজাত কৃতজ্ঞতাবোধ, আল্লাহ্-প্রেম ও আবদিয়াতের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে। এই 'আবদিয়াত ও আল্লাহ্-প্রেমই মানবতার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। মাছের জন্য পানি যেমন অপরিহার্য, মু'মিনের জন্য সালাতও তেমনি অপরিহার্য। পানির ওপরই মাছের জীবন নির্ভরশীল। ডাঙ্গায় তোলা মাছ যেমন ছটফট করে পানির জন্য, মু'মিনের রূহ্ ও আত্মাও তেমনি সদা ব্যাকুল চঞ্চল থাকে সালাতের জন্য। সালাতের সাথে মু'মিনের এ সুগভীর সম্পর্কের কথা পিয়ারা রাসূল (সা.) তাঁর উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ ভাষায়।

'সালাতের মধ্যেই রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।' [নাসাঈ]

অপর এক হাদীসে হযরত বিলাল (রা.)-কে সম্বোধন করে তিনি ইরশাদ করেছেন, "হে বিলাল! সালাতের ব্যবস্থা করে তুমি আমাকে শান্তি দাও।"

[আবূ দাউদ]

সালাত মমতাময়ী মায়ের মতো

মু'মিনের জন্য সালাত সেই মমতাময়ী মায়ের চেয়েও বেশী আপন যার বুকের অমৃত সুধার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর সব শিশুর জীবন। স্নেহমমতার আধার মায়ের কোলটি যেমন তার ইয়াতীম অসহায় ও অবুঝ আদরের দুলালের জন্য থাকে সদা উন্মুখ, শিশু যেমন ভয়ে কুঁকড়ে গেলে, ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হলে কিংবা কারো হাতে মার খেলে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলটিতে – মায়ের আঁচল ধরে শিশু যেমন ভাবে, তার কোন ভয় নেই, মু'মিনের জন্য সালাতও তেমনি এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, শান্তির আধার, রব ও 'আবদের মাঝে এক মজবুত সেতুবন্ধন। সকল প্রতিকূলতার মুখে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ও সর্বোত্তম সহায়। সালাত মু'মিনের আত্মার খোরাক। দুঃখ-ক্লিষ্ট ও বেদনাজর্জরিত হৃদয়ের জন্য শান্তির প্রলেপ। একমাত্র সালাতের মাধ্যমেই সে তার প্রতিপালকের কাছে পেতে পারে সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও সফলতার নিশ্চিত যামানত।

আল-কুরআন ইরশাদ করছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

"হে বিশ্বাসিগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা বাকারা ঃ ১৫৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র জীবন-চরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কখনও কোন সংকটের মুখোমুখি হলেই তিনি সালাতের আশ্রয় নিতেন সব কিছু ফেলে। প্রিয় সাহাবী হযরত আবূ হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন, কখনও কোন পেরেশানির সম্মুখীন হলে সাথে সাথেই রাসূল (সা.) সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। [আবূ দাউদ]

হযরত আবূদ্দারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ যখনই রাতে প্রবল বেগে ঝড় বইতে শুরু করত তখনই পেয়ারা নবী (সা.) দৌড়ে যেতেন মসজিদে এবং বাতাসের গতিবেগ কমে না আসা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। অদ্রূপ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময়ও তিনি গ্রহণ শেষ হওয়া অবধি সালাতে মশগুল থাকতেন। [তাবারানী]

আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.)-এর জীবদ্দশায় একবার তীব্র ধূলি-ঝড় শুরু হলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যমানায়ও কি এমন হতো? তিনি বললেন ঃ হতো। তখন সকলেই আমরা এই ভয়ে মসজিদে চলে যেতাম, হয়ত কিয়ামত এসে গেছে।

সালাতের প্রতি সাহাবা কিরামের কী প্রবল আকর্ষণ ছিল এবং সালাতে দাঁড়ালে পার্থিব জগত থেকে তাঁরা কেমন বেখবর হয়ে যেতেন তার কিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়া যায় মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে। হযরত জাবির (রা.) বলেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় আমরা একবার জুহায়নিয়া গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হলাম। তীব্র লড়াই চলছে। শত্রুপক্ষের যোদ্ধারাও অসাধারণ বীরত্বের সাথে লড়ছে। হাদীসের শেষ বাক্যটি হলো ঃ তারা বলাবলি করছিল, এখন এমন এক সালাতের ওয়াক্ত সমুপস্থিত যা মুসলমানদের নিকট সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা প্রিয় অর্থাৎ এটাই মুসলমানদের ওপর আক্রমণের মোক্ষম সময়।

দেহ বুদ্ধি ও হৃদয়ের ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব

সালাত কোন শারীরিক কসরৎ কিংবা ফৌজী অনুশীলনের নাম নয় যেখানে হৃদয়ের সজীবতা ও প্রাণের স্পর্শ নেই, নেই ইচ্ছা ও স্বাধীনতার লেশমাত্র স্থান। এটা এমন এক আমল যেখানে দেহ, আকল ও কল্‌ব সমান অংশীদার। প্রতিটিরই রয়েছে স্ব স্ব ভূমিকা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব। শরীর দায়িত্ব পেয়েছে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা ইত্যাদি সম্পাদনের। মুখের কাজ হচ্ছে তিলাওয়াত ও তাসবীহ জ্ঞাপন। আকলের কাজ হলো চিন্তা, গবেষণা ও মুরাকাবা। কল্‌বের কাজ হলো খুশু-খুযু তথা হৃদয়ের একাগ্রতা ও আর্দ্রতা। এই তিনের সুসামঞ্জস্য মিলনের মাধ্যমেই কেবল সালাত হতে পারে এক প্রাণবন্ত ও অর্থবহ ইবাদত। দেহ, কলব ও আকলের এই সমন্বিত ভূমিকার কথা আল-কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। দেহের দায়িত্ব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ۔

"আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনয়াবনত অবস্থায় দাঁড়াও।" [সূরা বাকারা ঃ ২৮]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রুকূ-সিজদা করতে থাকো এবং আপন প্রভুর ইবাদত করতে থাকো। তবেই না তোমরা সফল হবে!" [সূরা হজ্জ ঃ ৭৭]

আকলের ভূমিকা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ۔

"হে বিশ্বাসিগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটেও যেও না। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মুখের কথাগুলো উপলব্ধি করতে পার।" [সূরা নিসা ঃ ৪৩]

কল্‌বের ভূমিকা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ۔

"মুমিনগণই শুধু সফলকাম হবে যারা সালাতে খুশু ও খুযু[১] অবলম্বন করে।

[সূরা মু'মিনূন ঃ ১-২]

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔

"তাদের পাঁজর শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর তারা তাদের রবকে ডাকে ভয় কম্পিত হৃদয়ে ও আশাভরা বুক নিয়ে। আর আমি যা দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।" [সূরা সিজদা ঃ ১৬]

দেহ বা শরীরই মানুষের সবটুকু নয় , বরং দেহ, আকল ও কলবের সমন্বয়ই হচ্ছে মানুষ। তাই শরীয়তের শ্রেষ্ঠ বিধান সালাতের মধ্যেই এই তিনের যৌথ প্রতিনিধিত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক।

ইয়াহূদী ধর্মপতি ও আইন রচয়িতাগণ সালাতকে শুধু নির্দিষ্ট নিয়মের অঙ্গ-সঞ্চালন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি।

অপর দিকে মূর্খ খ্রিস্টান পাদ্রী ও কতিপয় তথাকথিত সূফীবাদীরা সালাতকে মনে করেছে শুধু প্রেম ও ভক্তি নিবেদন এবং আহাজারী ও রোনাজারীর ক্ষেত্ররূপে। আবার কতিপয় দর্শন প্রভাবিত মগজের দাবি হচ্ছে, সালাত একটি ধ্যানমগ্ন মুরাকাবা বিশেষ। প্রত্যেকেই নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে সন্তুষ্ট। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, সকলেই এরা প্রকৃত সত্য থেকে বিচ্যুত এবং সালাতের মহাব্যাপকতা ও অলৌকিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সমান বেখবর।

হিকমতপূর্ণ অলৌকিক তরবিয়ত পদ্ধতি

বস্তুত সালাত হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের নাযিলকৃত সুগভীর হিকমতপূর্ণ এক অলৌকিক তরবিয়ত ব্যবস্থা। সালাতের মাধ্যমেই হবে মানুষের দাসত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ। এর মাধ্যমেই ইখলাস, আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিলোপের মহৎ গুণাবলীর ঘটবে পরিপূর্ণ বিকাশ যা তাকে পৌঁছে দেবে আল্লাহ্র সাথে সান্নিধ্যপূর্ণ সম্পর্কের স্বর্ণশিখরে। সালাতের এই ঐশী ব্যবস্থায় মানুষ শিক্ষা পাবে সকল শয়তানী চক্র ও তাগূতী ক্ষমতার বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের যারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও

১. খুশু-খুযু অর্থ দেহ ও মনের স্থিরতা, দেহের স্থিরতা হলো অনর্থক নড়া-চড়া না করা। মনের স্থিরতা হলো আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট ও একাগ্র হওয়া।

নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের উদ্ধত দাবিদার। কথায় ও কাজে, ভাবে ও বক্তব্যে নিজেকে আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়ে মানুষের কাছে যারা দাসত্ব ও আনুগত্য দাবি করে এবং নিজেদেরকে যারা মনে করে আইন প্রণয়ন ও জীবন বিধান প্রবর্তনের ক্ষমতাধারী। সালাতের এই অলৌকিক তরবিয়ত ব্যবস্থার আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে এমন এক ঈমানী নূর ও আধ্যাত্মিক শক্তি সৃষ্টি করে দেয়া যা তাকে সাহস যোগাবে সকল প্রকার পার্থিব লোভ-লালসা ও মোহ-লিপ্সার সফল মুকাবিলার, প্রবৃত্তির তাড়না ও নফসের প্ররোচনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, সকল মানবীয় দুর্বলতার ওপর চূড়ান্তরূপে বিজয়ী হওয়ার। তার অন্তরে থাকবে ঈমানের সেই আলোক-বর্তিকা যা তাকে দেখিয়ে দেবে মঞ্জিলে মকসুদের সিরাতুল মুসতাকীম। এ শক্তি বলেই আল্লাহ্‌র রাহে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাবে সে সকল প্রতিকূলতা দু'পায়ে দ'লে।

কিবলার তাৎপর্য

বায়তুল্লাহ্ হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ্‌র কিবলা। ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট নির্দেশ এই : দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল কলেমা বিশ্বাসী মুসলমান বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে দাঁড়াবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে। কালো গিলাফে আবৃত সেই বায়তুল্লাহ্ যা নির্মিত হয়েছে শুধু লা-শরীক আল্লাহ্‌র একক ইবাদতের উদ্দেশে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ -

"(আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশে) মানব জাতির জন্য যে ঘর সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয়েছে সেটা হলো মক্কায় অবস্থিত ঘর। সকলের জন্য বরকতময় এবং বিশ্বজাহানের জন্য হিদায়াতস্বরূপ।" [সূরা আল-ইমরান ঃ ৯৬]

তাওহিদী ও একত্ববাদের চিরন্তন প্রতীক হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ ও হযরত ইসমাঈল যবীহুল্লাহ্‌র সুমহান ত্যাগ ও কুরবানীর পুণ্য স্মৃতি বহনকারী সেই বায়তুল্লাহ্ যা আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকদের মনে জাগিয়ে তোলে মহান প্রতিপালকের নামে নিজের জানমাল কুরবানী করে দেয়ার অপূর্ব প্রেরণা, অফুরন্ত উদ্দীপনা। সেই সাথে যোগায় সীমাহীন দুর্যোগ কিংবা প্রতিকূল ঝড়-ঝাপটার মুখে অটল-অবিচল থাকার সাহস ও হিম্মত।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

"আর (তখনকার কথা স্মরণ করুন) যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা-গৃহের ভিত্ ওঠাচ্ছিলেন (এবং বলছিলেন), হে মহান প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে (এই বিনীত প্রচেষ্টা) কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সব কিছু জানেন ও বোঝেন। হে মহান প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন। আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে আপনার অনুগত একটি 'উম্মত' সৃষ্টি করুন এবং আমাদেরকে আমাদের দীনের আহকামসমূহ বাতলে দিন এবং আমাদের অবস্থার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন। আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই কৃপাময় ও দয়াবান।" [সূরা বাকারা ঃ ১২৭–১২৮]

ফিরিশতাগণের অবস্থিত বায়তুল মা'মুরের প্রতিচ্ছবি সেই বায়তুল্লাহ, যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং দুনিয়ার সকল তাগূতী চক্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন ও বিজয়োদ্দীপ্ত বিদ্রোহ ঘোষণার ওপর এবং যার শুধু অস্তিত্বটুকুই দুনিয়ার সকল অপশক্তি ও বাতিল মা'বুদের বিরুদ্ধে খোলা যুদ্ধের শামিল।

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ - رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهُ مِنِّيْ - وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"আর (তখনকার কথা স্মরণ করুন) যখন ইব্‌রাহীম বললেন ঃ হে মহান প্রতিপালক! এ শহরকে আপনি নিরাপত্তাময় করে দিন ; আমাকে, আমার বংশধরকে মূর্তি পূজা থেকে রক্ষা করুন হে প্রতিপালক! অনেক মানুষকেই এ মূর্তিগুলো গোমরাহ করেছে। যা'হোক, যারা আমার বাতানো পথে চলবে তারাই শুধু আমার দলভুক্ত। আর যারা আমার অবাধ্য হবে তবে আপনি তো ক্ষমাশীল, দয়াবান।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৩৫–৩৬]

সুতরাং এই বায়তুল্লাহ্‌কে কিবলারূপে কবুল করে নিয়ে প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার সেদিকে মুখ করে দাঁড়ানোর অর্থ হচ্ছে, শির্‌কের বিরুদ্ধে ইব্‌রাহীমী সংগ্রামের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর তাওহীদী আদর্শে জীবন গড়ার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ। এক কথায় এর অর্থ হচ্ছে নিজেকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর তাওহীদী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া।

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ـ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

"তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম ধর্মের ওপর অটল থেকো। তিনিই তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন।" [সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) তাঁর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা'য় এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"পবিত্র কা'বাগৃহ হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব, বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি যথাযোগ্য তা'জীম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের জন্যই অপরিহার্য কর্তব্য। আর সর্বোত্তম সময়ে, সর্বোত্তম অবস্থায় কা'বামুখী হয়ে দাঁড়ানোই হলো সর্বোত্তম শ্রদ্ধা নিবেদন ও যথার্থ সম্মান প্রদর্শন। কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোর আরেকটি হিকমত এই, এর ফলে নামাযীর অন্তরে জন্মলাভ করে খুশু-খুযু তথা একাগ্রচিত্ততা। হৃদয় ডুবে থাকে এক অপূর্ব ভাব-তন্ময়তায়, যেন গোলাম তার মেহেরবান মুনিবের সামনে বিনয়াবনত অবস্থায় দাঁড়িয়ে মনের আরযি ও আকুতি পেশ করছে। উপরিউক্ত হিকমতের কারণেই এটা সালাতের অপরিহার্য শর্তরূপে বরিত হয়েছে।"

[হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১ পৃ. ৩৬]

বস্তুত এই হিকমতপূর্ণ বিধান বিশ্ব মুসলিমের মাঝে এমন এক নযীরবিহীন আত্মিক ঐক্যের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে যে, মানুষ যতই ভাবে ততই শ্রদ্ধাভিভূত হয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র অপার হিকমত ও মহাপ্রজ্ঞার সামনে। জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি, হৃদয়ে হৃদয়ে ভাব বিনিময় এবং একযোগে একই বিন্দুতে সকলের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ লিখেছেন: "আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বায়তুল্লাহ্‌মুখী হয়ে দাঁড়ানো মানুষের অন্তরে খুশু-খুযু তথা আর্দ্রতা ও একাগ্রতা সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষরূপে সহায়ক। এর মধ্যে এমন একটা অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে যে, গোলাম মহানুভব রাজাধিরাজের মহিমময় দরবারে বুকে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান।"

শাহ্ সাহেব আরো লিখেছেন: "অন্তরের মনোযোগ ও একাগ্রতা একটা অপ্রকাশ্য বিষয়। সুতরাং তার আলামতস্বরূপ বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ওযু ইত্যাদির মত এটাও সালাতের অপরিহার্য শর্তরূপে স্বীকৃত হয়েছে। যেহেতু তা'জীম ও শ্রদ্ধা নিবেদন অন্তরের একটা কোমল অনুভূতি বিশেষ, যা চর্মচক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং তার আলামতস্বরূপ রুকূ-সিজদার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা এভাবেই সাধারণত মানুষ বাদশাহর সমীপে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।" [খ: ১, পৃ: ৭৩]

তাকবীরের তাৎপর্য

'আল্লাহু আকবর' এই তাকবীরের মাধ্যমেই নামায শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের এ তাকবীর মন্ত্রের মত দুর্বোধ্য কোন শব্দ নয়, বরং সকল যুগে, সকল দেশে ও সকল সমাজেই এর অর্থ ছিল খুবই সহজ ও বোধগম্য। ইতিহাস বারংবার পরীক্ষা করে দেখেছে এ তাকবীরের শক্তি ও ক্ষমতার প্রচণ্ডতা। ক্ষমতাদর্পী কত প্রতাপশালী সম্রাটের মজবুত সিংহাসন মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এই 'আল্লাহু আকবর'! ফাটল ধরিয়েছে স্বেচ্ছাচারী জালিমের ইস্পাতঘেরা প্রাসাদ দুর্গে।

মানুষ চিরদিন মাথা ঝুঁকিয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির সামনে। কত কাল্পনিক দেব-দেবতা অনাদিকাল ধরে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছে মানুষের কমযোর হৃদয়-রাজ্যে! কিন্তু 'আল্লাহ্ আকবর' এই যুগান্তকারী ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই হাওয়ায় মিশে গেছে তাদের সকল ভোজবাজি। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অনেক ত্রাস সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনায়ক, বিশ্ব-বিজয়ী সমরবিশারদ ও জাঁদরেল রাজনীতিবিদেরই আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে। আল্লাহ্র সমতুল্য বন্দনা ও আনুগত্য দাবি করেছে তারা মানুষের কাছে। ঐশী বাণীর মতই অভ্রান্ত ও অবশ্য পালনীয় ছিল তাদের প্রতিটি কথা ও নির্দেশ। কিন্তু স্বঘোষিত এই লৌহ মানবদের সকল দর্প ও অহঙ্কার, দম্ভ ও হঠকারিতাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে 'আল্লাহু আকবর'—এর একেকটি বিস্ফোরণের মুখে। তবে শর্ত, গভীর উপলব্ধি পরিপূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হতে হবে তা। বুঝতে হবে কোথায় কোথায় কি প্রচণ্ডরূপে আঘাত হানছে এই ছোট্ট শব্দ দু'টি। আল্লাহ্ পাকের অকল্পনীয় বড়ত্ব, অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও উপলব্ধিসহ একজন মানুষ যখন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে 'আল্লাহু আকবর'-আল্লাহ্ই বড়, আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ এবং এই বিশ্বাস যখন প্রবেশ করে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, দুনিয়ার

সকল তাগূতী শক্তির জাঁকজমক ও বাহ্যাড়ম্বরই তার কাছে তখন মনে হয় একান্তই অন্তঃসারশূন্য। ক্ষমতার দাপট ও শক্তির অন্ধ আস্ফালন এতটুকু ভীতি সৃষ্টি করতে পারে না তার অন্তরে। বিলাস-বৈভবের যাদুময়ী হাতছানি কিংবা জল্লাদের হুঙ্কার ও রক্ত চাহনি কোন কিছুই এক চুল বিচ্যুত করতে পারে না তাকে তার অবস্থান থেকে। ক্ষমতাদর্পী ও সম্পদগর্বী দুনিয়ার যে কোন মানুষের চোখে চোখ রেখে সত্য কথা প্রকাশ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না সে তখন। কিন্তু আবারও বলছি, গভীর উপলব্ধি, পরিপূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ের গভীর প্রকোষ্ঠ থেকে উৎসারিত হতে হবে এ শব্দ দু'টি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুবারক সান্নিধ্যের বদৌলতে পুণ্যাত্মা সাহাবাগণ 'আল্লাহ আকবর'—এই মহাবিপ্লবী শব্দ দু'টির মর্মবাণী যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের চিন্তা ও বিশ্বাসের জগতে এসেছিল অভাবিতপূর্ব এ বিপ্লব যা আমূল পাল্টে দিয়েছিল তাঁদের জীবনের গতিধারা। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এমনি এক স্বচ্ছ ধারণা ও গভীর বিশ্বাস তাঁরা লাভ করলেন। রোম-পারস্যের চোখ ধাঁধানো ও মন মাতানো বিলাসসম্পদ এক লহমার জন্যও বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি তাঁদের পবিত্র অন্তরে। তাঁদের আচরণে বরং একথাই প্রমাণিত হতো পারস্য সম্রাটের হীরা-পান্না ও মণি-মুক্তাখচিত মুকুটের চেয়ে মুজাহিদের ধূলি মলিন ছেঁড়া জুতোই তাঁদের কাছে ছিল বেশী মূল্যবান। রোম সম্রাটের দরবারের মহামূল্যবান গালিচার চেয়ে শহীদের শতছিন্ন ও রক্তলাল কাফনই তাঁদের কাছে ছিল অধিক প্রিয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, 'আল্লাহু আকবরের' অবিচল বিশ্বাস ও গভীর উপলব্ধিই ছিল তাঁদের সে শক্তির উৎস। সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি হযরত সা'দ (রা.) রিবঈ ইবনে 'আমের (রা.)-কে দূত হিসেবে পাঠালেন সেনাপতি রুস্তমের দরবারে। মুসলিম দূতকে প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ করার উদ্দেশে মহামূল্যবান মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরতে সাজানো হলো সেনাপতির দরবারকক্ষ। সবুজ গালিচায় ঢেকে দেয়া হলো সব কিছু। মাঝখানে এক স্বর্ণাসনে নরক গোলযার করে বসে আছে সেনাপতি রুস্তম। মাথায় দ্যুতি বিকিরণকারী মণি-মুক্তাখচিত মুকুট যা প্রথম দর্শনেই অভিভূত করে দিতে পারে যে কোন দর্শককে। যথাসময়ে দরবারকক্ষে এসে উপস্থিত হলেন রিব'ঈ বিন 'আমের (রা.)। আর তখনই ঘটল সেই অভাবনীয় কাণ্ড যা স্তব্ধ বিমূঢ় করে দিলো সেনাপতি রুস্তম ও তার চাটুকারদের। তালিযুক্ত জুব্বা, ছেঁড়া মোজা ও কাপড় পেঁচানো খাপহীন তরবারি—এই ছিল মুসলিম দূতের ভূষণ। আর ছোট আকৃতির একটি দুর্বল ঘোড়

ছিল তার বাহন। কিন্তু বিস্ময়ের অনেক কিছু বাকি ছিল তখনো। নরম গদিআটা স্বর্ণাসনের পায়ায় ঘোড়াটা বেঁধে কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে মুসলিম দূত সোজা এগিয়ে গেলেন সেনাপতি রুস্তমের দিকে সংহত পদক্ষেপে, স্বচ্ছন্দ গতিতে। দরবারীদের একজন তাঁকে তখন সেনাপতিকে যথাযোগ্য সম্ভ্রম প্রদর্শনের অনুরোধ জানাল। চূড়ান্ত বেপরোয়াভাবে তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি। তোমাদের আমন্ত্রণেই এসেছি। আমাকে অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দাওতো ভালো, নয়তো এখান থেকেই আমি ফিরে যাচ্ছি। পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ আঁচ করতে পেরে রুস্তম দরবারীদের থামিয়ে বলল ঃ ইজাযত আস্ত- আসতে দাও। 'আল্লাহ্ আকবর'– আল্লাহ্ই মহান, আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ– এই মহাবিপ্লবী বাণীর প্রতি অবিচল বিশ্বাসে বলীয়ান হযরত রিব'ঈ বিন আমের (রা.) মূল্যবান গালিচা মাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। সবুজ গালিচার স্থানে স্থানে ফুটো হলো তরবারির খোঁচায়। বিস্ময়-বিমূঢ় দরবারীদের নির্বাক দৃষ্টি চারদিক থেকে বিদ্ধ করেছিল তাঁকে। কিন্তু তিনি নির্বিকার? [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া–৭, পৃঃ ৯]

এই দৃঢ়-গভীর ঈমান ও বিশ্বাসের কল্যাণে ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে এমনি অভাবনীয় ও প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে বারংবার। যুগে যুগে এই বিশ্বাস এমন এক অপার্থিব শক্তি সৃষ্টি করেছে মানুষের অন্তরে, হাজ্জাজ বিন ইউসূফের মত কঠিনপ্রাণ জল্লাদ সাফফাকের মত রক্তপিপাসু সুলতান ও মামুনের মত উন্মাদ শাসকের সামনে দাঁড়িয়েও তাঁরা হক-কথা প্রকাশ করেছেন অকুতোভয়ে। ক্ষমতার আস্ফালন ও শাহী দরবারের জাঁকজমক বিলীয়মান বুদ্বুদের মতই অবাস্তব ও মূল্যহীন প্রতিভাত হয়েছে তাঁদের দৃষ্টিতে। ঐতিহাসিক 'আর-রাযী' সমসাময়িক বুযূর্গ শায়খুল ইসলাম 'ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামের এমনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যার প্রতিটি ছত্র থেকে ঠিকরে পড়ছে সেই ঈমানী তেজ ও নৈতিক বলের উজ্জ্বল দ্যুতি। আর-রাযী লিখেছেন ঃ

শায়খ 'ইয্যুদ্দীন একবার সুলতানের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে কিল্লায় প্রবেশ করলেন। ঘটনাচক্রে সেদিনটি ছিল ঈদের দিন। সুলতানের দরবার কক্ষে আয়োজন করা হয়েছে শাহী ঈদ উৎসবের। পূর্ণ শান-শওকত ও যথাযোগ্য আড়ম্বরের সাথে সুলতান সপারিষদ দরবারে সমাসীন। আমীর-উমারাহ সকলেই সসম্ভ্রমে, অবনত দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। কিন্তু সেই উৎসব অনুষ্ঠানে সকলের সামনেই নাম ধরে শায়খ ইয্যুদ্দীন সুলতানকে বললেন ঃ

হে আইয়ুব! তোমার অন্তরে কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই? রোয হাশরে সর্বশক্তিমান যখন জিজ্ঞেস করবেন, তোমাকে আমি মিসরের ক্ষমতায় বসিয়েছিলাম। সেখানে তুমি অবাধে মদ পানের অনুমতি দিয়েছ। হে আইয়ুব! একবারও কি ভেবে দেখেছ, তুমি তখন কি জবাব দেবে? বিস্ময়ের সুরে সুলতান জানতে চাইলেন, সত্যি কি এমন হচ্ছে? শায়খ পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ তবে কি আমি মিথ্যে বলছি? অমুক দোকানে তো প্রকাশ্যেই মদ বিক্রি হচ্ছে। সেই সাথে আনুষঙ্গিক অপকর্মও চলছে নির্বিঘ্নে। আর তুমি হে মিসর অধিপতি! হারেমের ভোগ লালসায় ও বিলাস লিপ্সায় ডুবে আছ আকণ্ঠ! এভাবে আমাদের শায়খ বেশ উচ্চঃস্বরে একেকটি শব্দ বলে যাচ্ছিলেন আর উৎকণ্ঠিত রুদ্ধশ্বাসে উপস্থিত দণ্ডায়মান দরবারীরা তা শুনে যাচ্ছিল। শায়খের অভিযোগ শেষে সুলতান কিঞ্চিৎ কৈফিয়তের সুরে বললেন ঃ কিন্তু এটাতো আমার পিতার আমল থেকেই চলে আসছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে শায়খ আল-কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "তুমি কি তাদের দলভুক্ত হতে চাও যারা বলত ; আমরা তো আমাদের পিতৃপুরুষদের এ পথেই চলতে দেখেছি।"

শায়খের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে আল-কুরআনের এ আয়াত শোনামাত্রই সুলতানের মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হলো। সে মুহূর্তেই উক্ত দোকান উচ্ছেদ ও তার মালিকদের গ্রেফতারের নির্দেশ জারি করলেন তিনি।

এদিকে শায়খ কিল্লা থেকে ফিরে আসার পূর্বেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এ চাঞ্চল্যকর খবর। সবাই আশঙ্কা করেছিল, এখনি হয়ত কিল্লার ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসবে শায়খের শহিদী লাশ। কিন্তু শায়খকে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে উৎফুল্ল জনতা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করল। আমি অগ্রসর হয়ে তাঁকে ঘটনা জিজ্ঞেস করলাম। স্মিত হেসে শায়খ উত্তর দিলেন ঃ প্রিয় বন্ধু! যখন আমি দরবারের শান-শওকত ও সুলতানের পুলকিত ভাব লক্ষ্য করলাম তখন আমার ধারণা হলো, মৃদু তিরস্কারের মধ্যেই তাঁর কল্যাণ নিহিত। অন্যথায় হয়ত তাঁর নফ্‌স তাঁর ক্ষতি করতে উদ্যত হবে।

আমি বললাম ঃ আপনার মনে কি তখন কোন ভয়-ভীতি জাগে নি?

উত্তরে শায়খ বললেন ঃ সুলতানের রাজকীয় শান-শওকত ও বিলাস প্রাচুর্যের মুকাবিলায় আমি যখন আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত ও ক্ষমতার সীমাহীন ব্যাপ্তির কথা কল্পনা করলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল সোনার সিংহাসনে একটি ভিজে বেড়াল কিংবা মাটির পুতুল বসে আছে। [তাবাকাতে শাফিয়া, খণ্ড ঃ ৫, পৃ. ৮২]

যুগে যুগে দেশে দেশে ঈমানী শক্তির এই অনুপম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবার। শায়খ মুহাম্মদ বিন মুবারক কিরমানী এ ধরনের আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন 'সিয়ারুল আউলিয়া' গ্রন্থে।

"প্রসিদ্ধ বুযূর্গ শায়খ কুতুবদ্দীন কখনো সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকে শাহী রেওয়াজ মাফিক ভক্তিসূচক সালাম করতেন না। এ কারণে সুলতান শায়খের ওপর কিছুটা রুষ্ট ছিলেন। একবার শায়খকে তিনি ডেকে পাঠালেন। শায়খ দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সিংহাসনে আলো করে বসে আছেন সুলতান। আমীর উমারাহ ও চাটুকারদের দল ঘিরে আছে তাঁকে। বাআদব দাঁড়িয়ে সকলে। চোখে-মুখে ভীতি ও সম্ভ্রমের ছাপ সুস্পষ্ট। শায়খের সঙ্গে তাঁর বালক পুত্র নূরুদ্দীনও ছিলেন। যেহেতু শাহী দরবারের অভিজ্ঞতা জীবনে এটাই তার প্রথম, তাই নিজেকে তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতবোধ করলেন। পুত্রের এ বিব্রত ও সন্ত্রস্তভাব শায়খের দৃষ্টি এড়ালো না। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ বাবা নূরুদ্দীন! ভুলে যেও না, আল্লাহ্ই হচ্ছেন সকল ক্ষমতার উৎস।

নূরুদ্দীন বলেছেন, পিতার মুখের এ ভাবগম্ভীর সাবধান বাণী আমার অন্তরে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করল যে, শাহী দরবারের অমূলক ভীতি এক মুহূর্তে উবে গেল কর্পূরের মত। এক আশ্চর্য শক্তি ও দৃঢ়তা অনুভব করলাম আমি। তখন মনে হচ্ছিল যেন মূল্যবান বস্ত্রাবৃত কোন লাশ বসিয়ে রাখা হয়েছে সিংহাসনের ওপর! [সিয়ারুল আউলিয়া ঃ ৩৫৩ –৩৫৪]

সালাতের প্রারম্ভে দু'আ ও যিকির

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সালাতের শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দু'আ পড়েছেন। সেগুলোর প্রতি হৃদয়ের সবটুকু পবিত্রতা ও একাগ্রতা নিয়ে একবার লক্ষ্য করুন। দেখুন, আল্লাহ্র বড়ত্ব, একত্ব ও পবিত্রতা, বান্দার ক্ষুদ্রতা ও নিঃস্বতা, ইখলাস ও বিনয়ের কী অনুপম প্রকাশ ও সহজ-সরল স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে!

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত সালাতের প্রারম্ভিক দু'আগুলো এই ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

"হে আল্লাহ্! তুমি চিরপবিত্র, চিরসুন্দর। তোমার নাম চিরবরকতময়।

সকলের উর্ধ্বে, সকলের শীর্ষে তোমার মর্যাদা। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।"

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ

"হে আল্লাহ্ পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যে দূরত্ব, আমার ও আমার পাপসমূহের মাঝেও সে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! সাদা কাপড় ধুয়ে যেমন শুভ্র-পরিচ্ছন্ন করা হয় আমাকেও তেমনি পাপমুক্ত ও পবিত্র করে দাও। হে আল্লাহ! স্বচ্ছ পানি দ্বারা আমার পাপসমূহ ধুয়ে মুছে দাও।"

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْسِهٖ ـ

"আল্লাহ্ই সকলের বড়। সকল প্রশংসা সর্বতোভাবে তাঁরই। সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই গুণগানে মুখরিত এ বিশ্বজাহান। হে আল্লাহ্! শয়তানের সব রকম অনিষ্টতা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

সালাতের মধ্যে খুঁৎ সৃষ্টি করা ও মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার জন্য শয়তান সবরকম কূট-কৌশলই প্রয়োগ করে থাকে। আল্লাহ্র বিশেষ রহমতই শুধু বাঁচাতে পারে মানুষকে শয়তানের সে কূট চক্রান্ত থেকে। আল্লাহ্ পাকের মদদ হলেই শুধু মানুষের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ সুন্দরভাবে সালাত সম্পাদন করা সম্ভব। তাই সালাতের শুরুতে বলা হচ্ছেঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"অসীম দয়াময় রহমান ও রহীম, আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।" আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ইরশাদ করছেন ঃ

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"যখন তুমি সালাত পড়বে তখন শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়ে নিও।"

সূরা ফাতিহার তাৎপর্য

এখন একবার সূরা ফাতিহার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করুন। হৃদয়ের বদ্ধ কপাট খুলে দিয়ে কিঞ্চিত উপলব্ধি করুন প্রতিটি আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম। বস্তুত সূরা ফাতিহা হচ্ছে আল-কুরআনের ই'জায ও অলৌকিকত্বের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ। আল-কুরআন কোন মানুষের উর্বর মেধার ফসল নয়। এ আল্লাহ্ পাকের চিরন্তন কালাম যা তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে নাযিল করেছেন স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর। এ কথা প্রমাণ করানোর জন্য সাত আয়াতবিশিষ্ট আল-কুরআনের এই ক্ষুদ্র সূরাটিই যথেষ্ট। জগত জোড়া খ্যাতির অধিকারী সকল মেধা ও প্রতিভা কিংবা সুসভ্য জাতিসমূহের সকল জাঁদরেল সাহিত্যিক, কথাশিল্পী, সংস্কারক, সমাজবিদ, মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মবিশারদদের সম্মিলিত সাধনা ও প্রচেষ্টাও সূরা ফাতিহার মত এমন সার্বজনীন প্রার্থনা ও মুনাজাত তৈরি করতে সক্ষম নয়, যে প্রার্থনা মানব জাতির সকল যুগের সকল শ্রেণীর সকল চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে পারে, পারে মানুষের বঞ্চিত আত্মাকে অফুরন্ত সম্পদ তৃপ্তি দিতে এবং সে প্রার্থনার মাধ্যমে বান্দা তার প্রতিপালকের কাছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করতে পারে হৃদয়ের উচ্ছল আকুতি ও প্রাণের স্নিগ্ধ উষ্ণতা। তাই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا -

"আপনি বলে দিন, জিন ও ইন্‌সান যদি এ কথার ওপর সংঘবদ্ধ হয় তারা এমন একটি কুরআন রচনা করবে, তবু তারা তা করতে সক্ষম হবে না, যদিও তারা একে অপরের সহযোগী হয়।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮৮]

জ্ঞানগর্বী অবিশ্বাসীদের লক্ষ করে আল-কুরআন আরো ইরশাদ করেছে ঃ

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ

تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ۔

"আমার বান্দার ওপর আমি যে 'কিতাব' নাযিল করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তবে আল-কুরআনের যে কোন একটি সূরার মত সূরা পেশ কর এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সকল সহযোগীকে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা তা না পার এবং কখনো পারবেও না – তবে সে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ ও পাথর।"

[সূরা বাকারা ঃ ২৩–২৪]

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক সূরা ফাতিহা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ۔

"এবং নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে সাতটি আয়াত দান করেছি যা বার বার পঠিত হয়। আর দিয়েছি মহান আল-কুরআন।" [সূরা হিজর ঃ ৮৭]

'আলহামদু' দিয়ে সূরা ফাতিহার শুরু। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটা এমন এক মর্মবহুল শব্দ যার নিখুঁত ভাষান্তর শুধু দুরূহই নয়, অসম্ভবও বটে। একজন কৃতজ্ঞচিত্ত ও অনুগত বান্দার জন্য প্রার্থনা ও মুনাজাত এবং রুকূ-সিজদা ও কিয়াম তথা সালাত শুরু করার পক্ষে 'হাম্দ'ই হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়।

এখন প্রশ্ন হলো; কার জন্য আমার এই হাম্দ ও সালাত? আমার এই বিনয়কাতর বন্দনা ও ইবাদত? কে তিনি? কি তাঁর পরিচয়? এ উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাচ্ছি সাথে সাথেই। লিল্লাহি রাব্বি'ল-আ'লামীন – প্রাণের উষ্ণতা ও হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে আমি যাঁর ইবাদত বন্দনায় নিমগ্ন, যার গুণকীর্তনে আমার রসনা পরিতৃপ্ত তিনি কোন গোত্র, গোষ্ঠী ও পরিবারের রব নন, নন বিশেষ কোন দেশ ও জাতির সংরক্ষিত প্রতিপালক। তিনি রাব্বু'ল-আ'লামীন। সমগ্র বিশ্ব জাহান এক পরিবারভুক্ত এবং তিনিই এ বিশ্ব-পরিবারের একক প্রতিপালক। এই বিপ্লবাত্মক আকীদা ও বিশ্বাস কারো হৃদয়ের কোমল পলিমাটিতে একবার শিকড় গেড়ে বসলে স্বভাবতই সে আপোসহীন যুদ্ধ ঘোষণা করবে সকল কৃত্রিম বিভেদ-বিভক্তি ও মনগড়া শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে যা মানব জাতিকে শতধা বিভক্ত করে বিশ্ব মানবতার করেছে চরম অসম্মান, সৃষ্টিকুলের ওপর করেছে নির্মম অবিচার। তাই ইসলাম মানবতার নব নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে

প্রথমেই দু'টি একত্বের ঘোষণা দিয়েছে এবং এ দু'টি একত্বের ওপরই মানব সমাজের সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা সর্বাংশে নির্ভরশীল।

প্রথম খালিক ও রব তথা স্রষ্টা ও প্রতিপালকের একত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্ই মানুষ ও বিশ্বজাহানের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এই সৃষ্টি ও প্রতিপালনের ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক কিংবা সহযোগী নেই, নেই কোন পরামর্শদাতা। তিনি ওয়াহদাহু লা শরীক।

দ্বিতীয় মানব জাতির আদি পিতার একত্ব অর্থাৎ সাদা-কালো, আরব-আজম সকলেই আমরা এক আদমের সন্তান। আর আদম হলেন মাটির সৃষ্টি। দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের এ পার্থক্য একান্তই গৌণ। কেননা প্রত্যেক মানুষই আত্মিক ও দৈহিক সম্পর্কের দু'টি মহান সূত্রে আবদ্ধ। একদিকে আমরা আল্লাহ্ পাকের একক পরিবারভুক্ত। এই বিশ্ব-সংসার সাজিয়ে তিনিই আমাদের লালন-পালন করছেন। অপরদিকে আমরা এক আদমের পরিবারভুক্ত। একই পিতার সন্তান আমরা সকলে। এভাবেই ইসলাম বুনিয়াদ রেখেছে মানব জাতির সর্বজনীন ঐক্যের এবং এরই ওপর ইসলাম মানবতার নবনির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিতে চায়।

আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং নিকটাত্মীয়তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর সদা দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা নিসা ঃ ১]

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে চিহ্নিত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে পরহেযগার সে-ই আল্লাহ্‌র কাছে বেশি সম্মানের অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।" [সূরা হুজরাত ঃ ১৩]

ইসলামের এই মূলনীতির ব্যাখ্যাস্বরূপ মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন ঃ

"জাহিলিয়াতের সাম্প্রদায়িকতা ও পূর্বপুরুষদের কীর্তি নিয়ে বড়াই করা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। মানুষ শুধু দু'ভাগে বিভক্ত : পরহেযগার মুসলমান কিংবা ফাসিক ও পাপাচারী। সকল মানুষই আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরী। তাকওয়া ও পরহেযগারী ব্যতীত অনারবদের ওপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" [তিরমিযী]

অতঃপর মুসল্লী (সালাত দণ্ডায়মান ব্যক্তি) আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য সিফাত ও গুণের মধ্যে সর্বাগ্রে সেই মহান গুণটির কথা স্মরণ করে যা এক মুহূর্তেই হতাশা ও নিরাশা জর্জরিত মানুষের মুষড়ে পড়া অন্তর সজীব করে তোলে আশা ও সান্ত্বনার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে। হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে পরম নির্ভরতার সাথে তাই সে ঘোষণা করে সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল 'আলামীনের, যিনি রহমান-রহীম-করুণা ও রহমতের আধার। বস্তুতপক্ষে এই মুহূর্তে বান্দা আল্লাহ্ পাকের করুণা ও রহমতের বড়ই কাঙ্গাল কেননা সে এখন করুণাময় মহামহিমের পাক দরবারে এসে দাঁড়িয়ে বিনয়াবনত, লাজনম্র ও অনুতাপদগ্ধ অন্তর নিয়ে, নিজের সকল দীনতা, নিঃস্বতা ও মুখাপেক্ষিতা স্বীকার করে। 'আবদিয়ত ও বন্দেগীর চূড়ান্ত প্রকাশের এই অনাবিল মুহূর্তে তার মনপ্রাণ রাব্বুল আলামীনের করুণা ও রহমতের স্নিগ্ধ পরশ লাভের জন্য পিপাসা-উন্মুখ থাকবে, এটাইতো স্বাভাবিক!

এরপর সে স্মরণ করে আখিরাতের বিচার দিনের কথা, যেদিন বিচারকের আসনে আল্লাহ্ পাকের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ঘটবে চূড়ান্ত প্রকাশ। তলব করা হবে জীবনের প্রতিটি মূহূর্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশ। দুনিয়ার প্রবল প্রতাপশালী

শাহানশাহও সেদিন বমাল ধরা পড়া চোরের মত থরথর করে কাঁপবে আল্লাহ্‌র ভীষণ ক্রোধ ও কঠিন আযাবের ভয়ে। জলদ-গম্ভীর স্বরে আল্লাহ্ সেদিন ঘোষণা করবেন ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-

"কার রাজত্ব আজ? (কিন্তু মুখ খোলার মত সাহস কার হবে সেদিন! আল্লাহ্ পাক নিজেই উত্তর দেবেন) ঃ ক্ষমতা ও রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি মহাপ্রতাপশালী।" [সূরা মু'মিন ঃ ১৬]

প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের ঈমান বিশ্বাস ও বিচার দিনের কঠিন শাস্তির ভয়ই বিবেকের কঠোর প্রহরা বসাতে সক্ষম মানুষের হৃদয়ের নিভৃতে, সক্ষম অন্যায় ও দুষ্কৃতির পঙ্কিল পথ থেকে বিরত রেখে তাকে ন্যায় ও সুকৃতির পথে উৎসাহিত করতে এবং মানব জীবনকে কল্যাণ ও সফলতার পথে পরিচালিত করতে। হাজারো প্রলোভনে ঘেরা এই দুনিয়ায় একজন মুসলমানের জন্য আখিরাতের বিশ্বাস ও বিচার দিনের ভয় যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তা উপলব্ধি করার জন্য কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না।

এরপর সে আরবী ভাষার যে ভাষায় নাযিল হয়েছে আল-কুরআন এবং সালাতসহ সকল ইবাদতে যে ভাষা লাভ করেছে মুসলিম উম্মাহ্‌র একক ভাষার সম্মান, অলঙ্কার শাস্ত্রের সবটুকু সৌন্দর্য ও সুষমা এবং বলিষ্ঠতা ও সাবলীলতা প্রয়োগ করে সে ঘোষণা করে, আমি স্বীকার করি না আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব এবং প্রার্থনা করি না আল্লাহ্ ছাড়া কারো সাহায্য।

বস্তুত জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনের ঘটনাপ্রবাহ প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় বাধ্য হয়ে মানুষ দু'টি কাজ করে। কোন না কোন শক্তির আনুগত্য সে স্বীকার করে নেয় এবং কোন না কোন শক্তির সামনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। 'আনুগত্য স্বীকার এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা' এ দু'টি বিন্দুতেই সদা আবর্তিত হচ্ছে মানব জীবন। এ দু'টোই হচ্ছে সবলের সাথে দুর্বলের, শাসকের সাথে শাসিতের, ধনীর সাথে গরীবের তথা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বুনিয়াদ। কিন্তু একজন মুসলমান যেহেতু প্রথমেই এ দৃপ্ত ঘোষণা দিয়েছে, সে শুধু আল্লাহ্‌রই ইবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যই শুধু তার কাম্য, যেহেতু কোন শক্তির কাছে সে তার মাথা নত করে না, কোন শক্তির সামনে তার হাত প্রসারিত হয় না, তাই মানবীয় গোলামির সকল গ্লানি, অভিশাপ থেকে সে চিরমুক্ত–চির-আযাদ। একজন মুসলমান আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রতিদিন পাঁচবার এ প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করে থাকে এবং সালাত তাকে জোগায় এ শক্তি।

এরপর সে আল্লাহ্ পাকের কাছে সকাতর আবেদন জানায় 'সিরাতুল মুস্তাকীম' লাভের। 'সিরাতুল মুস্তাকীমে'র সেই সরল-সত্য পথ যা তাকে পৌঁছে দেবে অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ চিরশান্তির জান্নাতে। বস্তুত 'সিরাতুল মুসতাকীমে'র সন্ধান লাভই তার জীবনের বড় লাভ আর এ থেকে বঞ্চিত হওয়ার একমাত্র পরিণাম হলো অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের বিভীষিকাময় শাস্তি ভোগ। এ হিদায়তে ও সত্য পথ লাভ তাত্ত্বিক উপায়ে সম্ভব নয়। এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন আমাদের সামনে 'সিরাতুল মুস্তাকীমে'র কোন জীবন্ত আদর্শ ও বাস্তব নমুনা থাকবে। মানবেতিহাসের সেই উজ্জ্বল তারকারাজি হচ্ছে 'সিরাতুল মুস্তাকীমে'র বাস্তব নমুনা যাঁদেরকে আল-কুরআন "আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীন" নামে অভিহিত করেছে। আল-কুরআনসহ বিগত আসমানী কিতাবসমূহ দুনিয়ার সকল মানুষকে এঁদেরই অনুসরণ করার এবং এঁদেরই পবিত্র প্রেমে স্নাত হয়ে জীবন গড়ে তোলার দাওয়াত দিয়েছে যুগে যুগে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ـ

"এঁরাই আল্লাহ্র হিদায়তে লাভ করেছেন। অতএব, তোমরা এঁদেরই অনুসরণ কর। [সূরা আন'আম ঃ ৯০]

সবশেষে মুসল্লী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে, 'সিরাতুল মুস্তাকীম্' থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণামে যাদের ওপর নেমে এসেছে আসমানী আযাব অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ফলে যারা ডুবে গেছে ধ্বংসের চোরাবালিতে এবং যে ধর্ম ব্যবসায়ীরা আল্লাহ্র দীনকে বিকৃত করে এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে, মানুষকেও বিভ্রান্ত করেছে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আজীবন এ অভিশপ্তদের পাপ স্পর্শ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ –এই আমার মিনতি।

غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين ـ

"আমাকে পরিচালিত কর 'সিরাতুল মুস্তাকীমে'র পথে, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ তাদের পথে। যারা অভিশপ্ত; পথচ্যুত তাদের পথে নয়।"

[সূরা ফাতিহা ঃ ৫–৭]

সূরা ফাতিহার পর মুসল্লী আল-কুরআনের যে কোন একটি অংশ যা তার পক্ষে সহজে পাঠ করা সম্ভব, তিলাওয়াত করে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنَ -

'অতঃপর তুমি পড় যতটুকু তোমার জন্য সহজ।" সূরা ফাতিহার মর্মবাণী হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল করে দেয়াই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। চারা গাছে পানি দিলে যেমন তা সবুজের ছোঁয়া পেয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে এটা যেন ঠিক তেমনি। একথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সালাত যেমন একটি ইবাদত তেমনি তা একটি প্রশিক্ষণও।

সিজদার তাৎপর্য

সালাত দণ্ডায়মান ব্যক্তি ধীর, পর্যায়ক্রমে সিজদার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমে সে আল্লাহ্ পাকের দরবারে বুকে হাত বেঁধে বিনয় নম্র ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। সূরা ফাতিহায় তাঁর করুণা ও রহমত এবং লালন-পালন ও বিচার দিনের একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে নিবেদন করে হৃদয়ের সকৃতজ্ঞ প্রশংসা। সেই সাথে ঘোষণা করে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য স্বীকার এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি। এর পর হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে মহামহিমের কাছে মিনতি জানায় 'সিরাতুল মুস্তাকীমে'র পথে পরিচালিত করার এবং সেই পাপাত্মাদের পাপস্পর্শ থেকে হিফাজত করার যারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছে, মানুষকেও বিভ্রান্ত করেছে। এরপর সে রুকূতে অর্ধনত হয়ে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে– 'সুবহানা রাব্বিয়া'ল-'আজীম'। আমার মহান প্রতিপালক চিরপবিত্র ও মহান। এক মুহূর্তের জন্য আবার সে উঠে দাঁড়ায়। খুশু-খুযূ ও বিনয়নম্রতায় তার অন্তর তখন পূর্ণ বিগলিত। রহমত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় হৃদয় উদ্বেলিত। নিজের হীনতা, ক্ষুদ্রতা, শূন্যতা নিঃস্বতার জাগ্রত অনুভূতিতে তার অভিমান ও অহংবোধ আহত ও কুণ্ঠিত। এভাবে সকল প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে সে সিজদাবনত হয়। মহান পরওয়ারদিগারের পাক দরবারে ধূলিলুণ্ঠিত হয় তার চিরউন্নত শির। রুকূতে সে বলেছিল ঃ সুবহানা রাব্বিয়া'ল-'আজীম– আমার মহান প্রতিপালক চিরপবিত্র। কিন্তু আত্মবিলোপ ও 'আবদিয়াতের এই চরম ও পরম মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে বলে ওঠে ঃ আল্লাহ্র বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের সর্বশেষ শব্দটিও মহান "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা"। এ বিশেষ মুহূর্তে ধূলিলুণ্ঠিত অবস্থায় 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' ঘোষণাটি হয়ে ওঠে আরো অর্থবহ, আরো প্রাণবন্ত এবং তার 'আবদিয়াতের প্রকাশ হয় আরো মহিমান্বিত। এ সিজদার মাধ্যমে সে ভেঙে খান

খান করে দেয় মানুষকে মানুষের গোলাম বানানোর জন্য তৈরী সকল জিঞ্জির। কেননা যে মাথা মহান প্রতিপালকের পাক দরবারে একবার ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির সামনেই তা আর নত হতে পারে না।

বস্তুত সিজদায় গিয়ে একজন মু'মিন প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্যের এক নতুন জগতে যেখানে বুদ্ধি ও যুক্তির পরিবর্তে হৃদয়ই হচ্ছে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। চোখে নেমে আসে অশ্রুর বাঁধ ভাঙা জোয়ার যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতের সকল পাপ পংকিলতা। জীবন হয়ে ওঠে শিশিরভেজা প্রভাতের মতই স্নিগ্ধ-পবিত্র। হৃদয়ের শান্ত সমুদ্রে ওঠে ঝড় যার প্রবল দোলা অনুভূত হয় রাব্বুল 'আলামীনের রহমতের দরিয়াতেও। পূণ্যাত্মা সাহাবা (রা.)-গণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর সিনা মুবারক থেকে এমন অদ্ভুত আওয়াজ বের হতো যেন আগুনে ওপর কোন পাত্রে ফুটন্ত পানি টগবগ করছে! [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

হযরত 'আমর ইবন 'আস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 'সালাতুল কুসূফ' (সূর্য গ্রহণ কালীন নামায) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি সিজদার শেষ দিকে খুব গুরুত্বীর ও সুদীর্ঘ শ্বাস নিলেন এবং উফ! উফ! (ব্যথাসূচক ধ্বনি) করলেন। অতঃপর বললেন ঃ

"পরওয়ারদিগার! তুমি কি এ প্রতিশ্রুতি দাও নি যতদিন আমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান আছি ততদিন তাদের ওপর আযাব নাযিল করবে না? তুমি কি এ প্রতিশ্রুতি দাও নি যতদিন তারা 'ইস্‌তিগফার' করবে ততদিন তারা আসমানী আযাবে গ্রেফতার হবে না? [আবু দাউদ, নাসাঈ]

আল্লাহ্‌র পিয়ারা হাবীব তাঁর উম্মতকে জানিয়েছেন ঃ সালাতের মধ্যে সিজদাই হলো আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত এবং সিজদাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল। দয়ার সাগর, পিয়ারা হাবীব তাই তাঁর উম্মতকে এই শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে খুব বেশী করে দু'আ ও বিনয় প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও সিজদায় এ ধরনের দু'আ করতেন!

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ
لَايَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ اَمْرِىْ وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ

الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِيْ اَسْاَلُكَ مَسْاَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ دَمْوْعَهُ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهُ۔

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার কথা শুনছ এবং আমার অবস্থান দেখছ। আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছুই তুমি জানো। আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন নেই। আমি বিপদগ্রস্ত, অভাবী, ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত-সন্ত্রস্ত, আমার সকল পাপ অপরাধ আমি স্বীকার করছি। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই যেমন নিঃস্ব ব্যক্তি ভিক্ষা চায়। তোমার দরবারে মাথা কুটছি যেমন গুনাহ্গার পাপী-তাপী মাথা কুটে। তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি যেমন ভীত, বিপদগ্রস্ত মানুষ জানায় এবং মিনতি জানাচ্ছি ঐ ব্যক্তির মত যার মাথা তোমার কাছে ঝুঁকে আছে, যার চোখ থেকে (অনুতাপের) অশ্রু ঝরছে, যার দেহমন তোমার কাছে বিনয়-বিগলিত এবং যে নিজের নাক তোমার সামনে মাটিতে ঘষছে। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে দু'আ চাওয়ার ব্যাপারে আমাকে হতাশ করো না এবং আমার ওপর তুমি মেহেরবান ও করুণাময় হয়ে যাও।"[১]

আমরাও তো প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত হই। কিন্তু কত নিষ্প্রাণ আমাদের এ সিজদা! আজ এ ইতিহাস কে বিশ্বাস করতে চাইবে যে, এ সিজদার শক্তিতে একদিন পাহাড় টলে যেত, যমীন কেঁপে উঠত, শান্ত সমুদ্রে ঝড় উঠত, এমন কি আল্লাহ্র আরশও দুলে উঠত! বড় বড় প্রতাপশালী শাহান্শাহ্ ও ক্ষমতাদর্পী বাদশাহর গর্বিত মাথা নুয়ে পড়ত এ সিজদার অমিত শক্তির সামনে। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনা সাক্ষী হয়ে আছে। এ প্রেমময় সিজদাই মুসলিম জাতিকে কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার মুখে এবং বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে যুগিয়েছে শক্তি, সাহস, উদ্যম ও প্রেরণা। কতবার সে স্তব্ধ করে দিয়েছে ইতিহাসের গতিধারা, পাল্টে দিয়েছে কত জাতির ভাগ্য! পরাজয়ের আশঙ্কায় হতোদ্যম জাতিকে দিয়েছে বিজয়ের আনন্দ আর বিজয় গর্বে উল্লসিত জাতিকে করেছে পর্যুদস্ত।

---

১. হানাফী ফিকাহ মতে এ ধরনের দু'আসমূহ শুধু নফল নামাযের পরেই করা যেতে পারে। ফরয নামাযের সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা ছাড়া অন্য কোন দু'আ পড়া যাবে না।

প্রথম সিজদার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য সে উঠে বসে এবং দ্বিতীয় সিজদার জন্য লাভ করে নতুন উদ্যম ও প্রেরণা। ফলে দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সে উপভোগ করে এক ভিন্ন স্বাদ, অর্জন করে এক নতুন শক্তি।

দরূদ পাঠের হিকমত

রুকূ সিজদাসহ নামাযের সকল অংশ সমাধা করার পর সমাপ্তি বৈঠকে তাশাহুদের মাধ্যমে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে পেশ করে দরূদ ও সালাম। আস্‌সালামু আলায়কা ... হে নবী! আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হোক! এরপর সে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর প্রিয় নবীর ওপর করুণা ও রহমতের বারিধারা বর্ষণ করার আবেদন জানায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা ... ... "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন যেমন শান্তি বর্ষণ করেছেন হযরত ইবহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসার একমাত্র যোগ্য এবং মহামর্যাদাবান।"

"হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর বরকত নাযিল করুন যেমন বরকত নাযিল করেছেন হযরত ইব্‌রাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসার একমাত্র যোগ্য এবং মহামর্যাদাবান।"

যুগে যুগে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূলগণই ছিলেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মিলন-সেতু। তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করেছে আল্লাহ্‌র মা'রেফাত ও সঠিক পরিচয়। তাঁর জাত ও সিফাতের নির্ভুল জ্ঞান। তাঁদের নির্দেশিত পথ ধরেই মানুষ জাহিলিয়াতের সকল গুমরাহী ও বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে লাভ করেছে দুনিয়া ও আখিরাতের চিরন্তন কামিয়াবী ও সফলতা। এজন্য তাঁরা নিরলস সাধনা ও প্রচেষ্টা এবং যে নজীরবিহীন ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেছেন, সর্বোপরি মানুষের কল্যাণ কামনার অপরাধে মানুষেরই হাতে যে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও ও সীমাহীন যাতনা ভোগ করেছেন আল-কুরআনে তার কিঞ্চিৎ নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। তাই মানুষেরও উচিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁদের ইহ্‌সান ও অবদান স্বীকার করে নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা সত্যের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের স্বভাব ও ফিতরতেরই অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই জান্নাতবাসিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ-ছানা ও প্রশংসার সাথে তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলদের কথাও স্মরণ করবে সকৃতজ্ঞ চিত্তে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ـ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ـ

"আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা যিনি আমাদের এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন সে পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের জন্য কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি না আল্লাহ্ পাক আমাদের হিদায়াতের ব্যবস্থা করতেন। আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলগণ অবশ্যই সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন।' [সূরা আ'রাফ ঃ ৪৩]

এ 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' তথা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে সত্যের বাণী পৌঁছানোর সাধনায় যে কুরবানী 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পেশ করেছেন, নির্দয় মানুষের হাতে তেইশটি বছর যে নির্যাতন ভোগ করেছেন-- পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সম্মিলিত ত্যাগ ও কুরবানীও সে তুলনায় খুবই সামান্য। যে মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (স) মক্কার বুকে 'দাওয়াত ইল্লাল্লাহ্'র কাজ শুরু করেছিলেন তখন এই যমীনের বুকে হাতে গোণা কয়েকজন মানুষই শুধু এমন ছিলেন যাঁরা সম্পূর্ণ শিরক্ মুক্ত অবস্থায় এক আল্লাহ্র 'ইবাদত করতেন। কিন্তু গোটা আরব উপদ্বীপে আল্লাহ্র এমন কোন বান্দা খুঁজে পাওয়া যেত না, যে একথা বিশ্বাস করে "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই"। অবস্থার ভয়াবহতা অনুধাবন করার জন্য এটাই যথেষ্ট, খোদ কা'বা ঘরের ভেতরেই ছিল তিন শ' ষাটটি মূর্তি, যে ঘর তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ) একদা নির্মাণ করেছিলেন এক আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশে।

আইয়ামে জাহিলিয়াতের ইবাদত ও সালাতের চিত্রও ছিল বড় হাস্যকর। আল্-কুরআনের ভাষায় ঃ

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً ـ

"বায়তুল্লাহ্র সামনে তাদের 'সালাত' হাততালি কিংবা শিস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।" [সূরা আনফাল ঃ ৩৫]

কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় শিরকের সর্বগ্রাসী অন্ধকার ভেদ করে তাওহীদের প্রভাত-সূর্য উদিত হলো এবং বাতিলের সকল চক্রান্ত সত্ত্বেও আপন গতিতেই সে সূর্যের আলো চারদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। জীবন সায়াহ্নে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দু'চোখ ভরে দেখলেন তাঁর নবুওত কাননের ফলে-ফুলে সুশোভিত দৃশ্য। দিকে দিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ছে পত্পত্ করে। দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে ইসলামের শান্তি পতাকার সুশীতল ছায়াতলে। একের পর এক মসজিদ নির্মিত হচ্ছিল আরবের কোণায় কোণায়। প্রতিটি জনবসতি থেকে ভেসে

াসছিল আযানের মিষ্টি মধুর সুর, "এসো সালাতের দিকে" "এসো সফলতার দিকে।" কোন মসজিদেই তখন তিল ধারণের জায়গা নেই, এমন কি মৃত্যুশয্যায় গতর আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যখন মসজিদে তশরীফ নিয়ে ালাত পড়ানোর শক্তিটুকুও রহিত হয়ে গেছে, তখনও মসজিদে নববীতে সল্লীদের সংখ্যা ও উদ্যমে কোন ভাটা পড়ে নি। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আল্লাহ্‌র নবী যরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত মা আয়েশাকে বলেছেন ঃ আয়েশা, পর্দাটা একটু রাও! আমি দেখতে চাই আমার উম্মত কি করছে। পর্দা সরান হলো। উম্মত খন সিজদায়। তাই দেখে হৃদয়-প্রাণ জুড়াল আমার নবীজীর।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রতিটি জনপদে কোটি কোটি মুসল-ান আজ যে সালাত আদায় করছে, মসজিদের মিনারে মিনারে মুয়ায্যিনের মধুর কণ্ঠে প্রতিদিন পাঁচবার এই যে তাওহীদের বাণী বিঘোষিত হচ্ছে তা কি হাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাওয়াত ও জিহাদ এবং ত্যাগ ও কুরবানীর ফল য়? আল্লাহ্‌র হাম্‌দ সানার পর সালাতের শেষ পর্বে একজন মুসলমান তাঁর বীজী (সা.)-এর খেদমতে সকৃতজ্ঞ সালাম পেশ করবে, আল্লাহ্ পাকের রবারে নবীজীর ওপর বরকত ও রহমতের বারিধারা বর্ষণের প্রার্থনা জানাবে, টাই কি স্বাভাবিক নয়? এ ছাড়াও দরূদ ও সালামের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক বরাট হিকমত। কেননা যে ব্যক্তি একথা বিশ্বাস করবে মানবশ্রেষ্ঠ হযরত াসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও আল্লাহ পাকের রহমত ও করুণা এবং বরকত ও কল্যাণের খাপেক্ষী স্বাভাবিকভাবেই এ বিশ্বাসও তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, পৃথিবীতে মন কোন মানুষ নেই যার প্রয়োজন নেই আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণার, বরকত ও কল্যাণকর। তদ্রূপ সৃষ্টিজগতে এমন কোন মাখলূক নেই যে, কোন দিক দিয়ে াল্লাহ্‌র শরীক ও সমকক্ষতার দাবিদার হতে পারে। এই দরূদ ও সালাম কৃতপক্ষে শির্‌কের শেষ আশংকা টুকুরও মূলোৎপাটন করে দিয়েছে চিরতরে।[১] াল্-কুরআনে আল্লাহ্ পাকও মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন নবীজীর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠানোর। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

---

১ এ ধারণাটুকু মাওলানা মঞ্জুর নু'মানীকৃত معارف চতুর্থ খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে।

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ও ফিরিশতাগণ নবীর ওপর রহমত পাঠান। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও তাঁর ওপর রহমত (দরূদ) পাঠাও।" [সূরা আহযাব ঃ ৫৬

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.)-ও তাঁর উম্মতকে দরূদ ও সালামের প্রতি উৎসাহি করেছেন বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে।[১]

মু'মিনের আত্মবিশ্বাস ও শ্রেণী নির্ণয়

আল্লাহ্র হাম্দ ও ছানা এবং রাসূল পাক (সা.)-এর খেদমতে দরূদ ও সালাম পেশ করার পর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি নিজেও পেতে চায় এ সালাম রহমতের কিঞ্চিৎ অংশ। কেননা সে আল্লাহর রহমত ও করুণার মুখাপেক্ষী। তা দেহ-মন বরকত ও কল্যাণের শীতল বারিধারার জন্য কাতর, উন্মুখ। তাই পর আত্মবিশাস ও নির্ভরতার সাথে সে বলে ঃ আস্সালামু 'আলায়না - - শান্তি বর্ষি হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের ওপর। এভাবে নিজেই নিজের স্থান ও শ্রেণী নির্ণয় করে দিয়ে ঘোষণা করেছে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গ অনুকূল-প্রতিকূল প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে সে সালিহীন তথা আল্লাহ্র নে বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর এবং শান্তি ও রহমত লাভের বেলায়ও তাদের সমান অংশীদার হতে ইচ্ছুক। বস্তুত এ দিক-নির্দেশক ঘোষণা মু'মি হৃদয় থেকে সকল প্রকার হতাশা ও হীনমন্যতাবোধ দূর করে দিয়ে জ্বেলে দে আশার এক অনির্বাণ প্রদীপ। এক অবিচল আত্মবিশ্বাসে সে হয়ে ওঠে বলীয়ান কেননা এ ঘোষণা তাকে একই কাতারে, একই মর্যাদায় এনে দাঁড় করি দিয়েছে উম্মতের সকল রহমত প্রাপ্ত ও করুণাধন্য ব্যক্তিদের সাথে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওলী, বুযুর্গ, আলিম, মুজাহিদ আহলুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদে এক বিরাট জামা'আত। এঁদের সম্পর্কে আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে –

أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"এঁরাই আল্লাহ্র দলভুক্ত এবং মনে রেখো, আল্লাহ্র দলভুক্তরাই চিরন্ত সফলতার অধিকারী।" [সূরা মুজাদালা ঃ ২২

অতঃপর নিজের জন্য সে বিশেষভাবে দু'আ ও মুনাজাত করে এবং আল্লাহ্ আশ্রয় প্রার্থনা করে জীবন-মৃত্যুর কঠিন পরীক্ষা থেকে, কবরের ভয়াবহ শাস্তি

১. দরূদ ও সালাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এবং দরূদ ও সালামের তাৎপর্য ও বিভিন্ন চমকপ্র ঘটনাসম্বলিত আল্লামা ইবনুল কায়্যিমকৃত صلوة السلام على خير الانام جلاء الافهام في গ্রন্থটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

াহান্নামের বিভীষিকাময় আযাব থেকে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করে 'অভিশপ্ত াজ্জালে'র আগত ফিত্না থেকে। কেননা নিশ্চিন্ত নিরাপদে এই কঠিন হূর্তগুলো পার হয়ে যাওয়া আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। াদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

"আল্লাহ্র নবী নূহ্ (আ)-এর পর প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতিকে দাজ্জালের ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক করে গিয়েছেন। আমিও তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিত্না স্পর্কে সতর্ক থাকার উপদেশ দিচ্ছি।" [তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

ইমাম মুসলিম হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেনঃ

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিম্নোক্ত দু'আটি এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমনু াল্-কুরআনের প্রতিটি আয়াত শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাদের বলতেন, "বলো, হ আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের আযাব থেকে এবং াশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি দাজ্জালের ফিত্না থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ রেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তাশাহ্হুদ থেকে ফারিগ হয় তখন সে যন চারটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করেঃ জাহান্নামের আযাব থকে, কবরে আযাব থেকে, জীবন-মৃতুর ফেতনা থেকে, দাজ্জালের ফেতনা থকে।[১]

ালাতের সুসমাপ্তি

সালাতের প্রতিটি অংশ সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে আদায় করার পরও একজন সলমানের বিনয়নম্র অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকা দরকার যে, আল্লাহ্ পাকের বাদতের পূর্ণ হক আদায় করা এবং সালাতের যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করা তার ক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তার অন্তর বিনয়াদ্র, লাজ-নম্র ও অনুতাপ-দগ্ধ। এজন্যই স সেই মহান প্রার্থনা বাক্যটির মাধ্যমে শেষ করে তাঁর সালাত যা আল্লাহ্র াসূল শিখিয়েছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকর (রা.)-কে।

---

১. দাজ্জালের ফেত্না সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন লেখকের تأملات في القران নামক তাফসীর গ্রন্থ [তাফসীরে সূরা কাহাফ]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ
اغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

"হে আল্লাহ্! আমি আমার নফসের ওপর অনেক জুলুম করেছি। তুমি ছাড় এমন কেউ নেই আমার গুনাহ্ মাফ করতে পারে। অতএব, তুমি তোমার নি গুণে আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার ওপর রহম কর। নিঃসন্দেহে তু ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [বুখারী

এভাবে লজ্জা ও অনুতাপের সুতীব্র অনুভূতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতা বিনম্র স্বীকৃতির মাধ্যমে এই সর্বোত্তম ইবাদতটির সুসমাপ্তি ঘটে। কো ইবাদতের জন্য এর চেয়ে অপূর্ব সুন্দর পরিসমাপ্তি আর কী হতে পারে?

সালাত তার ওপর চাপিয়ে দেয়া কোন নির্দেশ নয় যা সে অনিচ্ছা সত্ত্বে একান্ত বাধ্য হয়ে পালন করছে, বরং সালাত হচ্ছে মু'মিনের আত্মার খোরাক সালাত হচ্ছে মু'মিনের মি'মরাজ। কেননা সালাতের মাধ্যমেই একজন মু'মি লাভ করে আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য ও সান্নিধ্য। তাই একজন মু'মিন দী সাজা ভোগের পর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর মত ছট্‌ফট্ করে না সালাত থে বেরিয়ে আসার জন্য, বরং অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর অবস্থায়, ধীর-সুস্থভাবে ও অনুপ ভক্তির এক পবিত্র ভাব নিয়ে সে পরিসমাপ্তি টানে সালাতের, প্রথমে ডানে পরে বামে মুখ ফিরিয়ে সালাম নিবেদন করে মুসল্লী সাথীদের এবং উপস্থি ফিরিশ্‌তাদের উদ্দেশে যেন এতক্ষণ এই লোকজগতে বিচরণ করেছে সে এব দীর্ঘ সফরের অনুপস্থিতির পর এখন আপনজনদের সাথে আবার মিলিত হচ্ছে সালাম বিনিময় করছে।[১]

সালাত গায়রুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ

সালাত হচ্ছে ইখলাস, খুশু'-খুযূ', বিনয়-নম্রতা এবং আল্লাহ্ পাকের সা বান্দার গভীর সম্পর্ক তথা 'আব্‌দিয়তের চূড়ান্ত প্রকাশ। একজন মুসলমান যদি সালাতের পূর্ণ হাকীকত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যদি নিছক প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এবং যদি সালাতে মর্মবাণী হৃদয়-বীণার তারে ঝঙ্কার তুলতে সক্ষম হয়, তাহলে একথা নিঃসন্দে সালাত এক আমূল বিপ্লব এনে দেবে তার এই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের জীবনে

১. এ ভাবটুকু নেয়া হয়েছে মাওলানা কাসেম (র.)-কৃত-কেবলানুমা' থেকে।

সালাতের বাইরে কোলাহলপূর্ণ জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনেও নিজেকে সে রাঙিয়ে তুলবে নামাযের রঙে। সালাতই নিয়ন্ত্রণ করবে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ। বস্তু জাহেলিয়াতের জীবন পদ্ধতি তথা গায়রুল্লাহ্‌র বন্দেগী ও গোলামীর সাথে কোনই সম্পর্ক নেই প্রকৃত সালাতের। গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত[১] ও গায়রুল্লাহ্‌র গোলামীর[২] জিঞ্জির থেকে মানুষকে চিরআযাদ করে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত ও গোলামীতে নিয়োজিত করাই হচ্ছে সালাতের লক্ষ্য। সালাতের প্রতিটি রুকন ও সূরাতু'ল-ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের মাধ্যমে যাবতীয় গায়রুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আপোসহীন বিদ্রোহের বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতিই সে ঘোষণা করেছে আল্লাহ্ পাকের দরবারে।

সালাতের শুরুতেই দৃপ্ত কণ্ঠে সে ঘোষণা করেছে, 'আল্লাহ আকবর'—আল্লাহ্‌ই সকলের বড়, কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। সুরাতু'ল–ফাতিহার মাধ্যমে সে ঘোষণা করছে, আল্লাহ্‌ই যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র যোগ্য। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ দাবি করতে পারে না আমার সকৃতজ্ঞ প্রশংসা। বিশ্ব-সংসারের তিনিই একমাত্র প্রতিপালক। এই প্রতিপালনের ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ওয়াহ্‌দাহু লা-শরীক। পরম করুণাময় তিনি। তাঁর করুণার নেই কোন অন্ত এবং তাঁর করুণাই শুধু আমার কাম্য। আমি শুধু তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁরই দুয়ারে সাহায্যের হাত পাতি। পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন শক্তিই আমার বন্দেগী দাবি করতে পারে না এবং অন্য কারো দুয়ারে আমার এর হাত প্রসারিত হতে পারে না।

রুকূ'-সিজদার মাধ্যমে সে ঘোষণা করছে, আমার এ মাথা তাঁর পাক কদমে লুটিয়ে পড়ার জন্যই শুধু সৃষ্টি হয়েছে। তাই পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির সামনে নত হতে পারে না আমার চিরউন্নত শির। এজন্যই ইতিহাসের পাতায়-পাতায় আমরা দেখি আল্লাহ্‌র যে সব প্রিয় বান্দা সালাতের হাকীকত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সালাতেরই রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল যাঁদের পাক জীবন, প্রবল প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহ্‌দের রক্তচক্ষুর সামনেও তাঁরা ছিলেন অকুতোভয়, নির্ভীক। নিষ্ঠুরতম জালিমের সামনে দাঁড়িয়েও তাঁরা সত্য

---

১. শিরক, মূর্তিপূজা, কবর পূজা, পীর পূজা ইত্যাদি।

২. ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ, ধনিকশ্রেণী ও শাসকবর্গের তোষামোদ করা, তাদের কেউ লাভ-ক্ষতির মালিক-মুখতার মনে করা, মন যোগানোর উদ্দেশে জুলুম, অত্যাচার, পাপাচার ও অনাচারে তাদের সঙ্গী হওয়া কিংবা নিজের আকীদা , হৃদয় ও বিবেকের জলাঞ্জলি দেয়া।

প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি এতটুকু! দুনিয়ার চাকচিক্য, ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁরা ছিলেন নির্লিপ্ত, নির্মোহ। জুলুম ও পাপাচারের বিরুদ্ধে ছিলেন চিরআপোষহীন।

চরিত্র গঠনে সালাতের প্রভাব

সালাত হচ্ছে রাব্বু'ল-'আলামীনপ্রদত্ত এমন এক মহান নিয়ামত ও কল্যাণবর্ষী উপহার যা মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, পাপাচার, প্রবৃত্তির পূজা, ক্ষণিক ভোগ-বিলাসের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত করে পূত-পবিত্র ও শুচি-শুভ্র এক আদর্শ জীবনের অধিকারী করে তোলে, প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করে দেয় তার ভেতরের সকল সুকুমার বৃত্তি, চিরঅবারিত করে দেয় জান্নাতের সুপ্রশস্ত দুয়ার। এজন্যই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন ঃ সালাত হলো জান্নাতের চাবি। সালাত এমন এক নিয়ন্ত্রক শক্তিতে বলীয়ান যে, প্রকৃত নামাযী মসজিদের বাইরে কোলাহলপূর্ণ জীবনে, কোন দুর্বল মুহূর্তেও এমন কোন কাজ করতে পারে না যা সালাতের মর্যাদা খাটো করে দিতে পারে মানুষের চোখে। অলক্ষ্যে থেকে সালাতই মূলত নিয়ন্ত্রণ করে তার সকাল-সন্ধ্যার প্রতিটি গতিবিধি, এমন কি দুর্বল মন যদি কখনও শয়তানী প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়েও পড়ে তখনই বিবেক তাকে সাথে সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়, একটু পরেই তোমাকে দাঁড়াতে হবে মসজিদে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সিজদাবনত হতে হবে তাঁর পাক কদমে। তুমিই বল! কী মুখ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবে তুমি?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ مَا تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ -

"হে রাসূল! আপনি পড়ুন সেই কিতাব যা 'ওহীরূপে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায় করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্র স্মরণ এক অতি বড় জিনিস। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের সব কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন।"

[সূরা 'আনকাবূত ঃ ৪৫]

সালাত এমনই এক দুর্বার শক্তি যা এক মুহূর্তে পরিবর্তন করে দেয় মানুষের অভ্যস্ত জীবনের গতিধারা, এমন কি যে মানুষ আজীবন আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল

পাপাচারের ক্লেদাক্ততায়, যার জীবনের পরতে পরতে পুঞ্জীভূত ছিল কলুষ-কালিমা এবং নীচতা ও হীনতা, এমন পাপ-নিমগ্ন ব্যক্তিকেও সালাত মহত্তম চরিত্র ও উন্নত নৈতিকতার এমন সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয় যে, আকাশের ফিরিশ্‌তারাও তাকে তখন নিজেদের সমগোত্রীয় বলে ভাবতে শুরু করে। তার অন্তর তখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঈমানের জ্যোতির্ময় আলোতে। সে আলোর ইশারায় কন্টকাকীর্ণ পথের সকল প্রতিকূলতা দু'পায়ে ঠেলে পরম নির্ভরতার সাথে সে এগিয়ে যায় মঞ্জিলে মকসুদের দিকে।

কিন্তু এটা তখনি শুধু সম্ভব যখন আমার সালাত অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতা কিংবা নিছক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সে সালাত হবে হৃদয়ের আবেগ ও উষ্ণতায় জীবন্ত প্রাণবন্ত এক ইবাদত।

আল্লাহ্‌র নবী হযরত শু'আইব (আ.) যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদের দা'ওয়াত দিলেন এবং মাপে ফাঁকি দেয়াসহ সকল প্রকার অনাচার পরিহার করে পূত-পবিত্র ও পূণ্য-স্নাত জীবন যাপনের আহ্বান জানালেন, হযরত শুয়াইব (আ.)–এর বিস্ময়-বিমূঢ় জাতি তখন ভাবতে শুরু করল, কোন্ শক্তি হযরত শু'আইব (আ.)-কে বিদ্রোহী করে তুলেছে স্বজাতির সনাতন ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় গেড়ে বসা নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে? কোন্ শক্তি বলে হঠাৎ তিনি গোটা জাতির বিরুদ্ধে এক নতুন দা'ওয়াত নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন? হযরত শু'আইব (আ.)-কে তারা প্রায়ই দেখতো, তিনি 'সালাত' আদায় করছেন এবং এটাই একমাত্র বাহ্যিক আমল যা তাদের জীবনে অনুপস্থিত। মনে করল, তারা তাদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। তাই সোজা সরল ভাষায় হযরত শুআইব (আ.)-কে তারা বলল ঃ

أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

"তোমার 'সালাত' কি আমাদের এই নির্দেশই দেয় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পূজনীয় বিষয়গুলো ত্যাগ করব কিংবা আমরা বিরত থাকব আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা থেকে? তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান ও ধার্মিক লোক!" [সূরা হূদ ঃ ৮৭]

'ঈমান ও ইহ্‌তিসাবের[১] সাথে একজন মু'মিন যখন পাক-পবিত্রতা অর্জনে মনোযোগী হয় তখন একথা নিঃসন্দেহে বাইরের এই পবিত্রতার ভেতরেও এনে দেয় এক অনাবিল পবিত্রতা ও শুচি-শুভ্রতা, এনে দেয় নূরের স্নিগ্ধতা। আর এই বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের ফলে সে লাভ করে সালাতের প্রতিশ্রুত বরকত ও কল্যাণ লাভের পূর্ণ যোগ্যতা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওযুর তাহারাতকে আরো অর্থবহ ও পরিপূর্ণ করার উদ্দেশে অত্যন্ত তাকীদের সাথে উম্মতকে মিসওয়াকের তা'লীম দিয়েছেন, এমন কি তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

"যদি আমি উম্মতের কষ্টের কথা চিন্তা না করতাম তাহলে প্রতি সালাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।" [বুখারী ও মুসলিম]

সালাতের প্রস্তুতি ও পরিবেশ

সালাতকে আল্লাহ্ পাক যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা ও মহিমা দান করেছেন, সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদয়ে হৃদয়ে ভাব বিনিময়ের যে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মের ইবাদত কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সালাত সম্পর্কিত ইসলামের বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি-বিধানের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলেই এ সত্য দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

আযান

প্রথমেই আযান প্রসংগে আসা যাক। সালাতের আহ্বান ও ঘোষণা দানের জন্য ইসলাম আযান ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদের মিনার থেকে মুয়ায্‌যিনের সুমধুর কণ্ঠে ভেসে আসে আযানের অপূর্ব সুর-মূর্ছনা। কিন্তু আযান নিছক সালাতের আহ্বান ও ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

১. ঈমান ও ইহ্‌তিসাবের অর্থ এই প্রতিটি আমলের সাথে আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের ওপর বিশ্বাস করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক বাতানো আযাব ও সওয়াবের ওপর পরিপূর্ণ ইয়াকীন আনা। যে কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য এটা অপরিহার্য শর্ত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন , "মুসলমান বান্দা যখন ওযূ করে এবং মুখ ধোয় তখন পানির শেষ ফোঁটাটির সাথে চোখের দৃষ্টি দ্বারা কৃত তার সকল পাপ ঝরে যায়। যখন সে হাত ধোয় তখন পানির শেষ বিন্দুটির সাথে হাতেকৃত সকল পাপ ঝরে যায়, এমন কি সে যাবতীয় পাপ থেকে একেবারে পাক্‌সাফ হয়ে যায়।' মুসলিমের রেওয়াতের আরো আছে, যখন সে পা ধোয় তখন পানির শেষ বিন্দুর সাথে সাথে পায়ের সাহায্যে কৃত সকল পাপ ঝরে যায়।

একদিকে তাতে যেমন বিধৃত হয়েছে সালাতের মর্ম ও উদ্দেশ্য, অন্যদিকে সেখানে স্থান পেয়েছে ইসলামের সার-নির্যাস তথা তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা। আযানের এই অনাড়ম্বর, সহজ-সরল ঘোষণা যুগে যুগে আঘাত হেনেছে অসংখ্য অমুসলিমের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারে, ইসলামের অপূর্ব সৌন্দর্য তুলে ধরেছে তাদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে। ফলে শুধু আযানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন তাদের অনেকে, অথচ ইসলামের সত্যতার ওপর রচিত মুসলিম সাধক-মনীষীদের বিরাট বিরাট গ্রন্থ-ভাণ্ডার সামান্যতম আঁচড় কাটতে পারেনি তাদের হৃদয়ের শক্ত মাটিতে। এখানেই আযানের সাথে অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ঘোষণা পদ্ধতির পার্থক্য ও বিশিষ্টতা।

আল্লাহ্ পাকের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে এর শুরু, আর তাঁর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি। তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদাতের (সাক্ষ্য দানের) পর পরই বলা হচ্ছে ঃ এসো সালাতের দিকে! এসো সফলতার দিকে! সালাত ব্যতীত কামিয়াবী ও সফলতার অন্য কোন উপায় নেই। এই অপূর্ব শব্দ চয়নের ফলেই আযান ইসলামের তাবলীগ ও দা'ওয়াতের এক ব্যাপক, পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী মাধ্যমরূপে ইসলামের সেই প্রারম্ভিক যুগ থেকে অদ্যাবধি কাজ করে আসছে। মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিকে একই সাথে আকৃষ্ট করে সে। অলস ও কর্মবিমুখ মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে নব উদ্দীপনা ও নতুন প্রফুল্লতা। জাগিয়ে যায় গাফলতের সুখ নিদ্রায় বিভোর মানুষকে ঃ ঘুম থেকে নামায ভাল! ঘুম থেকে নামায ভাল!

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (র.) আযানের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ্র এটা ইচ্ছা নয়, আযানের ভূমিকা শুধু ঘোষণা দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এই, আযান হবে দীনের সার-নির্যাস তথা ইসলামের প্রতীক। গাফিল ও বেহুঁশকে সজাগ করেই ক্ষান্ত সে হবে না, বরং দীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রেও পালন করবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এজন্যই আযানের মধ্যে এতগুলো শব্দ যোগ করার প্রয়োজন ছিল। সেখানে থাকবে আল্লাহ্ পাকের যিকির, তাওহীদ ও রিসালতের শাহাদাত এবং সালাতের প্রতি আহ্বান। তবেই সে ওপরে বর্ণিত মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।" [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২]

পবিত্রতা ও তাহারাতের গুরুত্ব

সালাতের জন্য ওযূ-তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ـ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য ওঠো তখন তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধুয়ে নিও এবং মাথা 'মসেহ' করে নিও এবং গোড়ালিসহ পা ধুয়ে নিও। আর যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক তবে সারা শরীর পাকসাফ করে নিও। আর যদি তোমরা অসুস্থ কিংবা মুসাফির হও অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি 'প্রাকৃতিক কাজ' (পায়খানা-পেশাব) থেকে ফিরে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাক, এরপর (পবিত্রতা অর্জনের জন্য) পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিও অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও হাত ঐ মাটি দিয়ে মসেহ করে নিও। আল্লাহ্ তোমাদের বিপাকে ফেলতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের ওপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিতে চান যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"

[সূরা মায়িদা ঃ ৬]

মসজিদের ভূমিকা

মসজিদ হচ্ছে সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। বায়তুল্লাহ্ নামে আখ্যায়িত হওয়ার দুর্লভ সম্মান একমাত্র মসজিদের প্রাপ্য। কেননা মসজিদ শুধু আল্লাহ্র ইবাদত ও বন্দেগীর উদ্দেশেই নির্মিত। মসজিদের সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর নির্মাণ পদ্ধতি এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ভাব-গম্ভীর ও শান্ত পরিবেশ

যুগে যুগে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই সমানভাবে আকর্ষণ করেছে। বস্তুত মসজিদ হচ্ছে তাওহীদ ও একত্ববাদের চিরন্তন প্রতীক এবং এটাই হচ্ছে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের প্রার্থনাগৃহ থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ - رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ -

"(মসজিদ হলো) এমন ঘর যার সম্মান রক্ষার এবং যেখানে আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হওয়ার নির্দেশ আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন। যেখানে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করবে এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এতটুকু গাফিল করতে পারে না আল্লাহ্র যিকির থেকে, সালাত কায়েম থেকে এবং যাকাত আদায় করা থেকে। এরা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন হৃৎপিণ্ড ও চক্ষুসমূহ উল্টে যাবে।" [সূরা নূর ঃ ৩৬-৩৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا -

"মসজিদগুলো একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই। অতএব, সেখানে আল্লাহ্র সাথে আর কারো ইবাদত করো না।" [সূরা জিন ঃ ১৮]

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -

"প্রতিটি সিজদার সময় তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল সোজা রেখ এবং আল্লাহ্কে ডাকো, দীনকে শুধু তারই জন্য নির্ভেজাল করে। [সূরা আ'রাফ ঃ ২৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰبَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ -

"হে আদম সন্তান! প্রতিটিবার মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সময় নিজেদের পোশাক পরিধান করে নিও।" [সূরা আ'রাফ ঃ ৩১]

ইসলামের প্রথম যুগে মসজিদ যথার্থভাবে ছিল মুসলিম উম্মাহর দীন-দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। মসজিদই ছিল তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আত্মসংশোধন ও নৈতিক উৎকর্ষের উৎস। এখানেই মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় সকল সমস্যার সমাধান হতো, নির্দেশ জারি হতো বিভিন্ন বিষয়ে এবং সে নির্দেশ পালন ছিল ধর্ম ও রাষ্ট্রের অংশ। যখনই কোন বিরাট ঘটনা কিংবা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হতো এবং সে আলোকে কোন নতুন পথ-নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিত, তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হুকুমের ঘোষণা করে দেয়া হতো ঃ

الصلوة جامعة

অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমুপস্থিত। অতএব, অন্যান্য মহল্লার ও দূর-দূরান্তের মুসলমানদেরকে আজ নামাযের সময় মসজিদে নববীতে হাযির হতে হবে।

সমাজের বুকে মসজিদের এই গৌরবময় ভূমিকা অব্যাহত ছিল বেশ কিছুকাল। মসজিদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো গোটা মুসলিম উম্মাহ্র ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন। মসজিদই ছিল ইল্ম ও হিদায়াতের আলো বিকিরণের উৎস, সমাজ সংস্কার ও নৈতিক সংশোধনের কেন্দ্র এবং জিহাদের দুর্বার প্রেরণা ও শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা লাভের ক্ষেত্র।

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ গতিধারায় মুসলিম উম্মাহ্র সামাজিক জীবনও ঘুণে ধরল। সমাজের বুক থেকে ধীরে ধীরে মসজিদের প্রভাব লোপ পেল। এখন তো অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময় ছাড়া দিনরাত তালাবদ্ধ অবস্থায় বিরান পড়ে থাকে আল্লাহ্র ঘর মসজিদসমূহ।

তবে এখনও মসজিদ ক্ষীণ ধারায় হলেও সমাজের বুকে তার কিছুটা প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। নিভু নিভু অবস্থায় এখনও মসজিদ অমুসলিমদের হৃদয়ে ঈর্ষা জাগায়। কখনও তারা তাকিয়ে থাকে ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে, আবার কখনও উৎকণ্ঠিত ও সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে।

মুসলমানদের পুনর্জাগরণের মহান লক্ষ্যে মসজিদকে অবশ্যই তার হৃত ভূমিকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে ইসলামী ইতিহাসের সেই সোনালী অতীত। মসজিদকেই আবার বানাতে হবে আমাদের জীবন পরিক্রমার কেন্দ্রবিন্দু।

সালাতের আনুষঙ্গিক কতিপয় আদব

সালাতের ঈমানী শক্তি ও তার আধ্যাত্মিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত খুশু-খুযূ' তথা আল্লাহ্ভীতির ভাবটি সদা জাগরূক রাখার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও উপদেশ দান করা হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সালাতে রত হয় তখন তার মনে রাখা উচিত সে তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলছে। তার উচিত একান্ত প্রয়োজনবোধে সামনে অথবা ডানে থুথু না ফেলে বাম দিকে পায়ের নীচে ফেলা।"

অদ্রুপ নামাযী ব্যক্তিকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইমামের পরিপূর্ণ ও যথাযথ অনুসরণ করার। কোন কাজ যেমন সে ইমামের আগে করতে পারে না, তেমনি ইমামের পরেও করতে পারে না। অদ্রূপ বিশেষ কোন অবস্থার ওপর সে অবস্থা তার আত্মার জন্য যতই না তৃপ্তিদায়ক হোক, সে স্থায়ী থাকতে পারে না। সিজদায় গিয়ে তার হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গে যতই দোলায়িত হোক এবং যত স্বাদই সে উপভোগ করুক, ইমামের মাথা তোলার সাথে সাথে তাকেও মাথা তুলতে হবে। ইমামের পর আর এক মুহূর্তের জন্যও সিজদায় থাকার অনুমতি নেই তার। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ও ফরঁমাবরদারী ও রাসূল (সা.)-এর তরীকা অনুসরণই হচ্ছে সালাতের মূল কথা, আত্মার তৃপ্তি ও ইচ্ছার নির্দেশ মেনে চলা নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

"আমাকে যেভাবে সালাত আদয় করতে দেখ তোমরাও ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় করবে।" [বুখারী]

অন্যত্র আনাস ইব্নে মালিকের রিাওয়াতের ইরশাদ হয়েছে ঃ

"ইমামকে এজন্য ইমাম বানানো হয়েছে যে, তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।" [মুসলিম]

বস্তুত মসজিদের মধ্যেই আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গী সবচেয়ে বেশী প্রতিভাত হয়। মসজিদ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে কোন মানুষেরই আলাদা কোন মর্যাদা নেই, নেই ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ। রাজা-প্রজা, আমীর-ফকীর, ভৃত্য-মনিব

সব এক কাতারে শামিল হয়ে যায় যেখানে। আয়াযের পা লেগে সেখানে খসে পড়ে মাহমুদের তাজ।[১]

পুণ্যাত্মা সাহাবাদের পরবর্তী যুগে আমীর, সুলতান ও স্বেচ্ছাচারী খলীফাগণ নিজেদের কৌলিন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য মসজিদের অভ্যন্তরে যেসব আচার-আচরণ ও বিদ'আত প্রবর্তন করেছেন, ইসলামের সাথে সেগুলোর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদে সালাতের কাতারে কারো যদি কোন বৈশিষ্ট্য থেকেই থাকে তবে সেটা শুধু কুরআনের 'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা এবং দীনের সমঝ-বুঝ ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই হতে পারে। আল্লাহ্‌র রাসূল ইরশাদ করেছেন ঃ

"জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে। এরপর যারা তাদের চেয়ে একটু নীচে, এর পর যারা আরো একটু নীচে।"

[মুসলিম, কিতাবু'স-সালাত]

জামা'আতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

ফরয সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়ে আল্-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"রুকূ'কারীদের সাথে তোমরা রুকূ' কর।" [সূরা বাকারা ঃ ৪৬]

বস্তুত সালাতের স্বভাব ও প্রকৃতির এটাই দাবি। কেননা জামা'আতবদ্ধ অবস্থায়ই শুধু সালাত তার স্বকীয় মহিমায় ও নূরানীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবাগণ জামা'আতের ব্যাপারে আশ্চর্য রকম কঠোর ছিলেন। তাঁদের আমল দেখে মনে হতো জামা'আত বুঝি বা সালাতেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, এমন কি মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

১. সুলতান মাহমুদ একবার কিছুটা বিলম্বে মসজিদে যান। ফলে পিছনের সারিতে তাঁকে দাঁড়াতে হয়। আর সামনের কাতারে ঠিক তাঁর বরাবরে দাঁড়িয়েছিলো তাঁর গোলাম আয়ায। সিজদার সময় গোলাম আয়াযের পা লেগে সুলতান মাহমুদের মাথা থেকে তার মূল্যবান তাজ খসে পড়ে। সালাত শেষে সুলতান নীরবে অম্লান বদনে তাঁর তাজ মাথায় তুলে নেন। –[অনুবাদক]

জামা'আতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা পছন্দ করেন নি। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে মৃত্যু যন্ত্রণা-কাতর অবস্থায় জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ব্যাকুলতার কথা এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন (তখন সালাতের সময়) তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমি বললাম, না! তারা আপনার অপেক্ষা করছে, হে আল্লাহ্ রাসূল! তখন তিনি বললেন ঃ আমাকে একটি পাত্রে পানি দাও। আমি তাই করলাম। তখন তিনি ওযূ করে (জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য) উঠতে চাইলেন। কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আবার জানতে চাইলেন ঃ লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমি বললাম, না। তারা তো আপনার অপেক্ষা করছে, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেনঃ আমাকে একটি পাত্রে পানি দাও। আমি তাই করলাম। তিনি ওযূ করলেন এবং (জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য) উঠতে চাইলেন। কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। আবার যখন হুঁশ ফিরে এলো তখনও তাঁর সেই একই প্রশ্নঃ লোকেরা কি সালাত পড়ে ফেলেছে? আমি বললাম, না। তারাতো আপনার অপেক্ষায় আছে। লোকেরা তখন মসজিদে বসে সালাতু'ল-'ইশার অপেক্ষা করছিল। তখন তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে সালাত পড়ানোর জন্য বলে পাঠালেন।

জামা'আতের প্রতি পুণ্যাত্মা সাহাবাদের কী গভীর অনুরাগ ছিল এবং জামা'আতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা কেমন একনিষ্ঠ ও যত্নবান ছিলেন, নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা আমরা তার কিছুটা অনুমান করতে পারব।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ কখনও কখনও এমনো হতো যে, কোন ব্যক্তিকে দু'জন লোকের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে জামা'আতে হাযির করা হচ্ছে এবং কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

[মুসলিম ও আবূ দাউদ]

অন্য হাদীসে তিনি আরো বলেছেন –

"দু'ধরনের লোকই কেবল জামা'আতে অনুপস্থিত থাকতঃ প্রকাশ্যে মুনাফিক কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি, যার চলার শক্তিটুকু রহিত হয়ে গেছে"(অর্থাৎ বিনা কারণে কেউ জামা'আতে হাযির না হলে ধরে নেওয়া হতো সে মুনাফিক। তাই

মুনাফিকরাও ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জামা'আতে হাযির থাকত)। জামা'আত তরককারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠোর তিরস্কার বাণী উচ্চারণ করেছেন– সম্ভবত অন্য কোন বিষয়ে তিনি এতো কঠোর হননি। হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, কিছু লোক জামা'আতে উপস্থিত হয়নি। পেয়ারা নবী ইরশাদ করলেন : আমার ইচ্ছা হয় কাউকে আমার স্থানে সালাত পড়াতে বলে ঐ সব লোকের বাড়িতে যাই যারা জামা'আতে হাযির হয়নি এবং আগুন লাগিয়ে তাদের ঘড়-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই। কিন্তু নারী ও শিশুদের কথা ভেবে তা করতে পারি না।

[মুসলিম, বাবু ফাযীলাতু'স- সালাত]

জামা'আতের বিভিন্ন হিকমত ও কল্যাণকর দিক

জামা'আতবদ্ধ সালাতের মধ্যে আল্লাহ্ পাক অসংখ্য হিকমত ও কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং এর সামাজিক ও নৈতিক সুফলও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মসজিদে মসজিদে অনুষ্ঠিত প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আত আমাদের জন্য এক বিরাট সুযোগ এনে দেয় পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার এবং হৃদয়ে হৃদয়ে ভাব বিনিময় করার। জামা'আত সুসংসহত করে মুসলিম উম্মাহ্র সামাজিক একতা ও সম্প্রীতি। সর্বোপরি জামা'আত আমাদের শিক্ষা দেয় সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক মহান লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাওয়ার। ইসলামী উম্মাহ্র অনেক বিদগ্ধ লেখক চিন্তাবিদই এর ওপর আলোকপাত করে অনেক কিছু লিখেছেন এবং নিজেদের গবেষণালব্ধ ফসল দিয়ে ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু জামা'আতের মধ্যে আল্লাহ্ পাক এছাড়াও আরো অনেক সূক্ষ্ম হিকমত ও কল্যাণ নিহিত রেখেছেন যার সন্ধান সমসাময়িক অনেক লেখক-চিন্তাবিদই এখনও পেয়ে ওঠেন নি। একটি বড় হিকমত এই, যখন মুসলমানদের একটি জামা'আত এক সাথে এক কাতারে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দাঁড়ায় আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান হৃদয়ে, বিনয়-বিগলিত অশ্রুস্নাত চোখে প্রার্থনা জানায়, জানায় সকাতর ফরিয়াদ॥ তখন এই জামা'আতী প্রার্থনা, আহাজারি ও করুণা ভিক্ষা আল্লাহ্ পাকের রহমতের দরিয়ায় অবশ্যই তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। অযুত-সহস্র ধারায় নেমে আসে তাঁর অফুরন্ত করুণা ও রহমত, উপচে

পড়ে তাঁর সীমাহীন নিয়ামত। ইস্‌তিসকার সালাত (পানি প্রার্থনার সালাত), জুমু'আর সালাত ও হজ্জের বিরাট সমাবেশের মধ্যেও একই হিকমত সক্রিয়।

আরেকটি হিকমত হলো, জামা'আতের কারণে রীতিমত সালাত আদায় করা খুবই সহজ হয়ে পড়ে। নিজের বিভিন্ন দোষত্রুটিও ধরা পড়ে যা এতদিন তার অলক্ষ্যেই সালাতের মধ্যে রয়ে গেছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের সালাত সুন্দর, আরো সুন্দর ও নিখুঁত, আরো নিখুঁত করার এক অপূর্ব নীরব প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। জামা'আতের মাধ্যমে সালাতের মাসায়েল ও বিধি-বিধান শেখার সুযোগও পাওয়া যায় খুব সহজেই।

সবচেয়ে বড় ফায়দা এই, অনেক সময় আল্লাহ্‌র কোন প্রিয় বান্দার ইখ্‌লাস, তাকওয়া তথা বিশুদ্ধ নিয়ত ও বিনয়-নম্রতার বদৌলতে গোটা জামা'আত আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে স্থান পেয়ে যায়। আল্লাহ্‌র কোন খাস বান্দার হৃদয়ের সজীবতাই হয়ত সকলের ভগ্ন হৃদয় সজীব করে তোলে এবং একজনের ওসীলায় গোটা জামা'আতের সালাতই হয়ত আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে মকবুল হয়ে যায়। এ ধারণা শরীয়তের পরিপন্থী কিংবা বুদ্ধিবিবর্জিত নয়। কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"এরা এমন জামা'আত যাদের পাশে বসে থাকা ব্যক্তিরাও আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা থেকে বঞ্চিত হয় না।"

আল্লাহ্‌র রাসূল সালাতের কাতার সোজা করার বিষয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। যতক্ষণ প্রতিটি কাতার তীর-সরল না হতো, ততক্ষণ তিনি সালাত শুরু করতেন না, বরং এক্ষেত্রে কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে তিনি কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন। কেননা কাতার ঠিক না হলে জামা'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যাহত হয়ে যায়। কাতারে দাঁড়ানো অবস্থায় সাহাবাদেরকে মনে হতো যেন بنيان مرصوص বা সীসা ঢালা প্রাচীর!

বস্তুত জামা'আতবদ্ধ সালাত হলো মুসলিম উম্মাহ্‌র 'তারবিয়াতুল'ল-হায়াত' বা জীবন প্রশিক্ষণ। এখন কেউ যদি নিখুঁত, নির্ভুল জামা'আতবদ্ধ অবস্থায় সালাত আদায় করার ব্যাপারেই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তবে একথা কিভাবে বিশ্বাস করা যাবেদ্বীন ও দুনিয়ার অন্যান্য বিষয় পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাথে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে সে!

হযরত আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে রিওয়াত করেছেন ঃ

"তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে দাঁড়াও। কেননা কাতার দুরস্ত করে দাঁড়ানোটাও একামতে সালাতের (সালাত কায়েম করার) অন্তর্ভুক্ত।"

[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত নো'মান ইব্নে বশীর রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারগুলো তীরের মত সোজা করে দিতেন। একদিন তিনি তকবীর বলতে যাচ্ছেন এমন সময় দেখেন, জনৈক ব্যক্তি কাতার থেকে কিঞ্চিৎ আগে বেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে তিরস্কার করে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে দাঁড়াও। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক তোমাদের পরস্পরে মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন। [মুসলিম]

সালাতু'ল জুমুআর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

সালাতু'ল-জুমুআর বিভিন্ন আহ্কাম ও ফাযায়েল পর্যালোচনা করলে সন্দেহাতীত ভাবেই একথা প্রমাণিত হয়। সালাতু'ল জুমু'আ ইসলামের ইবাদত তালিকায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অর্জন, মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং তাকওয়া ও সৎ কাজের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সালাতু'ল-জুমুআর অবদান ও গুরুত্ব সত্যই অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমু'আর আযান দেয়া হয় তখন তোমরা সালাতের জন্য দৌড়ে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করে দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, অবশ্য যদি তোমাদের সে বোধ থাকে।" [সূরা জুমু'আ ঃ ৯]

হাদীস শরীফের কঠোর সতর্কবাণী এই ঃ

"যে কেউ অলসতা করে পরপর তিনটি জুমু'আ ছেড়ে দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন।" [তিরমিযী ও অন্যান্য]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

"জুমু'আর ব্যাপারে অলসতা পরিহার করা উচিত ; অন্যথায় আল্লাহ্ পাক মানুষের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন। তখন তারা গাফিলদের মধ্যে গণ্য হবে।" [মুসলিম, নাসাঈ]

পেয়ারা নবী আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

"আমার ইচ্ছা জাগে কাউকে আমার স্থলে সালাত পড়ানোর হুকুম দেই। অতঃপর যারা জুমু'আতে হাযির না হয়ে বাড়িতে বসে আছে তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেই।" [মুসলিম, নাসাঈ]

জুমু'আর সালাতের জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুরমা, খোশবু ব্যবহার করা ও উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার প্রতি বিভিন্ন হাদীসে বিশেষ তাকীদ এসেছে।

সালাতের পূর্বে মিম্বর হতে আরবীতে প্রদত্ত খুতবাই জুমু'আর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খুতবা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রাণহীন ও গতানুগতিক কোন খুতবা ছিল না, বরং তাঁর খুতবা হতো সংক্ষিপ্ত কিন্তু জীবন ও সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাঁর প্রতিটি বাক্যে থাকত সত্যের সমুজ্জ্বল পথ-নির্দেশনা, অকৃত্রিম হিতৈষণা। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্(সা.)-এর খুতবা সম্পর্কে রিওয়াত করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তাভ হয়ে উঠতো এবং স্বর উচ্চগ্রামে পৌছে যেতো। মনে হতো, বুঝি বা তিনি উপস্থিত সকলকে কোন হানাদার শত্রুবাহিনী থেকে সতর্ক করছেন!"

[মুসলিম, নাসাঈ]

সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী আল্লামা ইবনুল'-কায়্যিম তাঁর "যাদু'ল-মা'আদ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুতবায় উপস্থিত সাহাবাদেরকে ইস্‌লামের বিভিন্ন মূলনীতি, আহকাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। কোন বিষয় সম্পর্কে আদেশ বা নিষেধ দানের প্রয়োজন হলে খুতবার মধ্যেই তিনি তা করতেন।" [যাদু'ল-মা'আদ, খ. ১, পৃ.. ১১৫]

"নবুওতের কল্যাণ ধারায় একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ সুন্নাত বহাল ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে নবুয়তের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। খুতবা তার আসল প্রাণ, ভাব ও মর্ম হারিয়ে শাব্দিক চাকচিক্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। আহ্কাম ও বিধি-বিধান বর্ণনার মূল লক্ষ্য থেকে হটে গিয়ে বিষয় নিয়ে তারা মেতে উঠল, অথচ সেই মূল লক্ষ্যগুলোর প্রতি সামান্যতম গাফিলতিও ইসলামের দৃষ্টিতে ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। খুতবার ভাব ও মর্মবাণী জলাঞ্জলি দিয়ে ছন্দোবদ্ধ ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুশীলনেই তারা গলদ্ঘর্ম হতেন। এভাবে খুতবা একেবারেই অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ল।" [যাদু'ল-মা'আদ, খ. ১, পৃ. ১১৫]

বস্তুত এ যুগের ইমাম ও খতীবদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য জাহির করে সস্তা বাহবা কুড়ানো, বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন, ভিন্ন মত ও পন্থীদের অশালীন ভাষায় সমালোচনা এবং বল্গাহীন আত্মপ্রশংসাসহ কোন বিষয়ই তাদের খুতবা থেকে বাদ যায় না। ফলে শ্রোতা ও মুসল্লী সাধারণ প্রফুল্লচিত্ত, আশ্বস্ত ও উদ্দীপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ফিরে যান। তাদের অন্তরে খুতবার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধই আর অবশিষ্ট থাকে না। অথচ একজন মুসলিম হিসাবে খুতবার যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা তার অন্তরে থাকা অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খুতবার প্রতি লক্ষ্য করুন। কখনও তিনি এমন সুদীর্ঘ খুতবা দিতেন না যা একঘেয়ে ও বিরক্তিকর মনে হতে পারে, বরং তাঁর খুতবা ছিল জ্ঞানগর্ভ, বাস্তববাদী ও জীবনবোধসম্পন্ন এবং প্রাণের উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের উষ্ণতায় উত্তপ্ত। সে খুতবার প্রতিটি শব্দে ছিল জ্যোতির্ময় হেরার আলোর স্নিগ্ধ বিচ্ছুরণ। ফলে শ্রোতার অন্তর হতো আমলের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। তাঁর সচরাচর কথাবার্তার মত খুতবাও হতো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ও মর্মবহুল। প্রতিটি শব্দ যেন শ্রোতার হৃদয়ের নরম মাটিতে অঙ্কুরিত হয়ে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠত। তাঁর খুতবা কখনো এত দীর্ঘ হতো না যা শ্রোতার মনে সামান্যতম বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। আবার এত সংক্ষিপ্ত হতো না যা কোন প্রকার দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করতে পারে।

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সালাত ও খুতবা উভয়টি ছিল স্বাভাবিক (অতিমাত্রায় দীর্ঘও নয় – আবার সংক্ষিপ্তও নয়)। প্রথমে তিনি আল্-কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তারপর উপস্থিত সকলকে কিছু নসীহত করতেন।" [মুসলিম]

অন্য রিওয়াতে আছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন কোন লম্বা বক্তৃতা করতেন না, বরং মামুলি কয়েকটি কথা বলতেন।"

গভীর মনোযোগের সাথে আনুগত্যের মনোভাব নিয়ে খুতবা শ্রবণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে শ্রোতা প্রশান্তিপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে খুতবার প্রকৃত কল্যাণ ও উপকারিতা অর্জনে সক্ষম হয়। খুতবা চলাকালীন কোন প্রকার কথা বলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন, এমন কি অন্যকে কথা বলা থেকে বিরত করার উদ্দেশেও মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা খুতবা একটি ইবাদত, বক্তৃতা নয়। আর ইবাদতের জন্য ভাব-গম্ভীর ও প্রশান্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"জুমু'আর দিন কেউ যদি নিজের সাথীকে বলে 'চুপ কর', তবে নিজেই সে একটি অযথা কথা বলে ফেলল।" [আবূ দাউদ]

জুমু'আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে এটাই স্বাভাবিক, একটি শহরে শুধু একটি মসজিদে কিংবা সর্বনিম্ন সংখ্যক মসজিদে জুমু'আর জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে (অবশ্য বড় শহরে ভিন্ন কথা) এবং সপ্তাহে একবার সকল মুসলমান আল্লাহ্ পাকের ইবাদত ও পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত হবে। ফলে এই সাপ্তাহিক মিলন সুদৃঢ় করবে একতা ও ভ্রাতৃত্বের ইসলামী বন্ধন। অপর দিকে মুসলমানদের আমল ও ইবাদত, 'আকীদা বিশ্বাসকে হিফাজত করবে শির্ক ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশ থেকে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই মহান ইবাদতটির ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ চরম অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে, প্রদর্শন করেছে ক্ষমাহীন উদাসীনতা ও গাফিলতি। ফলে মুসলিম সমাজে সালাতু'ল জুমু'আ ইসলামের প্রথম যুগের মত কোন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না, বরং অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটিও আজ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে আচার-আনুষ্ঠানিকতার নিগড়ে।

জুমু'আ গোটা সপ্তাহের মানদণ্ড

একজন দায়িত্বশীল, কর্মব্যস্ত, জীবন সংগ্রামের কঠিন প্রতিকূলতায় ক্লান্ত ও জর্জরিত মানুষের জন্য সপ্তাহান্তে এমন একটি দিনের একান্তই প্রয়োজন ছিল, যেদিন সে জীবনের সকল কোলাহল ও কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর নিয়ে নিশ্চিত মনে প্রশান্ত হৃদয়ে নিজেকে সঁপে দেবে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত ও বন্দেগীতে,

দুনিয়ার সওদা ছেড়ে মশগুল হবে সে আখেরাতের সওদায়। সপ্তাহের ছুটির দিনে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলনের ফলে অন্তরের পর্দায় যে কলুষ-কালিমা পুঞ্জীভূত হয়েছে তা ধুয়ে মুছে হয়ে যাবে সে পূতপবিত্র ও পুণ্যস্নাত। আগামী ছ'দিনের কোলাহলপূর্ণ ও কর্মব্যস্ত জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য লাভ করবে নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্যম। সপ্তাহের মধ্যে শুক্রবার হলো সেই পবিত্র ও বরকতময় দিন। আর বছরের মধ্যে রমযান হলো সেই মুবারক মাস।

জুমু'আর দিনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ

"শুক্রবার হলো এমন একটি পবিত্র দিন যেদিন আল্লাহ্‌র ইবাদত ও বন্দেগীর জন্য একাগ্রতা ও যত্নবান হওয়া মুস্‌তাহাব। বিভিন্ন কারণে অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দিনটি অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রতিটি জাতিকেই আল্লাহ্ একটি বিশেষ দিন দান করেছিলেন যেন তারা দুনিয়ার কোলাহল ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হতে পারে। জুমু'আ মুসলমানদের জন্য তেমনি এক ইবাদত দিবস। সারা বছরের তুলনায় রমযানের যে ফযীলত ও মর্যাদা, সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় জুমু'আ দিবসেরও ঠিক ততটুকু ফযীলত ও মর্যাদা। রমযান শরীফে যেমন আছে পুণ্যময় রাত লায়লাতুল কদর তেমনি জুমু'আর দিনেও আছে এটি মুবারক মুহূর্ত যখন বান্দার সকল দু'আ ও প্রার্থনাই আল্লাহ্ পাক্ কবুল করেন। এই হিসাব জুমু'আর দিনটি যার অতিবাহিত হবে ভাল অবস্থায় এবং পুণ্য সাধনায়, সপ্তাহের অন্য দিনগুলোও তার অতিবাহিত হবে ভাল অবস্থায়। তদ্রূপ যার রমযান মাস অতিবাহিত হবে ইবাদত ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ সংস্পর্শে, তার সারা বছরটাই অতিবাহিত হবে পুণ্য ও পবিত্রতার মধ্যে এবং যার হজ্জ হবে কলুষমুক্ত, নিখুঁত– তার গোটা জীবনটাই হবে শুভ্র নিঃদাগ, নিষ্কলুষ ও পুণ্যস্নাত। ফলকথা, জুমু'আর দিনটি হলো সপ্তাহের মানদণ্ড এবং রমযান হলো বছরের মানদণ্ড। আর হজ্জ হলো সারা জীবনের মানদণ্ড এবং তাওফীক আল্লাহ পাকের হাতে।

দুই 'ঈদ

দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ও ধর্মের বিশেষ দিন ও পর্বগুলোর প্রতি একবার লক্ষ্য করুন! ইবাদত-বন্দেগী কিংবা শালীনতা ও পবিত্রতার কোন ছাপ সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বরং মনে হবে যেন বল্গাহীন ভোগ-বিলাস, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও চরম উচ্ছৃঙ্খলতাই এ দিনগুলোর প্রধান আকর্ষণ। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের জবাবে মদীনার আনসাররা যা বলেছিলেন তা মূলত এ ধ্যান-ধারণারই প্রতিনিধিত্ব করছে। হযরত আনাস বিন মালিক রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তশরীফ আনলেন তখন সেখানে দু'টো দিন বিশেষভাবে পালিত হতো। খেলাধুলা ও আনন্দ-স্ফূর্তিতে মদীনাবাসিগণ মেতে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ দিন দু'টো সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মদীনাবাসিগণ তখন আরয করলেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে এদিনগুলোতে আমরা খেলাধুলা ও হাসি-তামাশায় মেতে উঠতাম। এ কথা শুনে আল্লাহ্‌র রাসূল ইরশাদ করলেন, "এর পরিবর্তে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আরো উত্তম দু'টো দিন দান করেছেন ঃ 'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।"

বস্তুত ইসলাম কোন অবস্থাতেই মানুষের স্বভাব ও ফিত্‌রকে অস্বীকার করেনি। ইসলাম হচ্ছে স্বাভাবিক ও ফিত্‌রতের ধর্ম। তাই শরীয়তের প্রতিটি বিধান ও নির্দেশেরই মধ্যে রয়েছে স্বভাব ও ফিত্‌রতের পূর্ণ প্রতিফলন। দুই 'ঈদের বিধান তাই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুই 'ঈদের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক মুসলিম উম্মাহ্‌কে জাতীয়ভাবে বিশেষ আনন্দ প্রকাশের সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্‌র আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতি অন্যান্য জাতির আনন্দ প্রকাশের মত অন্তঃসারশূন্য হতে পারে না, বরং সেখানেও থাকবে পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার স্নিগ্ধ ছোঁয়া, থাকবে ধর্মীয় অনুভূতির অপূর্ব প্রকাশ, উন্নত নৈতিকতা ও মহত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ।

তাই 'ঈদের দিনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিশেষভাবে দু'রাকা'আত সালাত আদায়ের। প্রতি রাকা'আতে রয়েছে বাড়তি ছয় তাকবীর এবং ঈদগাহে যাওয়ার পথে ঘন ঘন তাকবীরের নির্দেশ। সালাতের পর রয়েছে খুতবার বিধান। এছাড়াও রয়েছে 'ঈদুল ফিতরে সাদ্‌কা ও দান-খয়রাত এবং 'ঈদুল আযহায় কোরবানীর বিধান। সালাতুল ঈদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রতি সপ্তাহে জুমু'আর দিনে মুসলমানগণ যেভাবে কোন বড় মসজিদে সমবেত হয় তেমনিভাবে আরো বিরাট আকারে বছরে দু'দিন জমায়েত হবে কোন প্রশস্ত মাঠে, খোলা আকাশের নিচে, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, মিলন ও ঐক্যের এক স্বর্গীয় পরিবেশে। কিন্তু সালাতুল জুমু'আর মত দু' ঈদের প্রতিও চরম অবিচার করা হয়েছে। এ পবিত্র দিন দু'টিও শিকার হয়েছে একই রকম উদাসীনতা ও গাফিলতির। ছোট-বড় সব মসজিদেই

দেদার পড়া হচ্ছে ঈদের সালাত। ফলে সালাতু'ল- 'ঈদও সমাজের বুকে কোন অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে, নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে তার ভাবমূর্তি এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যগুলোও অর্জিত হচ্ছে না যা শরীয়তের কাম্য ছিল। 'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (জীবনভর) ঈদের সালাত মদীনার পূর্ব প্রান্তের ঈদগাহে আদায় করেছেন। জীবনে মাত্র একবার বৃষ্টির কারণে তিনি ঈদের সালাত মসজিদে নববীতে আদায় করেছেন।"

[যাদু'ল-মা'আদ, খঃ ১ ঃ ১১৯]

দু' 'ঈদের গুরুত্ব ও হিকমত বর্ণনা প্রসংগে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) লিখেছেন ঃ

"প্রতিটি জাতি ও ধর্মের জন্যই এমন একটি জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন যেখানে সে ধর্মের অনুসারীরা একত্র হবে এবং নিজেদের শান-শওকত ও সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত করবে। এজন্যই 'ঈদের জামা'আতে শিশু-নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই উপস্থিত হওয়ার জন্য শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে (অবশ্য ঈদগাহে তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা থাকতে হবে) এবং এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক পথে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য পথে ফিরতেন যেন উভয় দিকের লোকদের চোখে মুসলমানদের শান-শওকত প্রতিভাত হয়। [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ২; ২৩]

দীনের পূর্ণাংগ হিফাজতের ক্ষেত্রে জুমু'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব

বিদ'আতের অনুপ্রবেশ কিংবা স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক বিকৃতি সাধনের হাত থেকে ইসলামী 'আকীদা ও মৌল বিশ্বাসের হিফাজত ও সংরক্ষণ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবাদের সযত্ন সাধনায় গড়া ইসলামী উম্মাহ্‌র ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামো চিরঅটুট রাখার ক্ষেত্রে জুমু'আ-জামা'আতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান এক অনস্বীকার্য সত্য। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন রূপে আঘাত এসেছে এ দীনের ওপর। কিন্তু জুমু'আ ও জামা'আতের কল্যাণেই শুধু দীন ইসলাম কারো হাতের ছেলেখেলার বিষয়ে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে, ইসলামী উম্মাহর শত ত্রুটিবিচ্যুতির কবল থেকে অথচ ইসলামপূর্ব অনন্য ঐশী ধর্মগুলোর মূল রূপ কি ছিল তা আজ জাঁদরেল গবেষকদেরও এক জটিল গবেষণার বিষয়। কিন্তু ইসলাম যেহেতু

আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত সর্বশেষ ও চিরন্তন ধর্ম, তাই তিনি নিজেই এর হিফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ না করুন, যদি মুসলিম উম্মাহ জুমু'আ ও জামা'আতের হুকুম ত্যাগ করে বসত এবং সকলে যার যার ঘরে একা একা সালাত আদায় শুরু করত, তাহলে একথা নিঃসন্দেহে সত্য, আজ ইসলামী ইবাদতের প্রকৃত রূপ বোঝাটাই মুশকিল হয়ে পড়ত, এমন কি চৌদ্দ শ' বছর আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাতের সাথে এ যুগের মুসলমানদের সালাতের কোন মিলই খুঁজে বের করা সম্ভব হতো না, দেশ ও অঞ্চল ভেদে সালাতের রূপ ও প্রকৃতিতেও দেখা যেত বিস্তর ব্যবধান। বিশ্বের দেশে দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেমন দুস্তর ব্যবধান। প্রতিটি দেশের কর্ণধারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা যেমন পরস্পরবিরোধী, তেমনি তাদের ইবাদতসমূহও আজ ধারণ করত পরস্পরবিরোধী আঞ্চলিক রূপ। ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও ভারতীয় ধর্মসমূহের মত মুসলমানগণও হয়ত আজ একেক রকম সালাত আদায় করত। এই হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্র ধর্মীয় ঐক্য ও ইসলামী আহকামের হিফাজত ও সংরক্ষণের জন্য জুমু'আ জামা'আত এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন হিকমত ও কল্যাণ ছাড়াও আরো এমন অনেক হিকমত রয়েছে যার প্রকৃত 'ইল্ম আল্লাহ্ পাকের জন্যই সংরক্ষিত। এ প্রেক্ষিতেই একাকী সালাতের তুলনায় জামা'আতবদ্ধ সালাতকে অনেক গুণে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে রিওয়ায়ে করেছেন ঃ

"জামা'আতের সাথে আদায়কৃত সালাত ঘরে কিংবা দোকানে (একাকী) আদায়কৃত সালাত থেকে পঁচিশ গুণ উত্তম। কেননা যখন কোন মানুষ ওযূ করে, অতঃপর মসজিদের দিকে চলতে থাকে এবং সালাতই শুধু তার উদ্দেশ্য হয় তখন প্রতি কদমে তার একটি দরজা বুলন্দ হয় এবং একটি গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়! যখন সে সালাত শুরু করে তখন ফিরিশ্তাগণ তার জন্য রহমত ও শান্তি কামনা করতে থাকে এবং বলতে থাকেঃ হে আল্লাহ্! আপনি তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন! হে আল্লাহ্! তাকে করুণা করুন! আর যতক্ষণ কোন মানুষ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ তাকে সালাতের মধ্যেই গণ্য করা হয়।"

[বুখারী, তিরমিযী]

হযরত ইব্নে উমর রিওয়ায়েত করেছেনঃ জামা'আতের সাথে আদায়কৃত সালাত একাকী আদায়কৃত সালাতের তুলনায় সাতাশ গুণ উত্তম।

[বোখারী, মিরমিযী]

অন্যান্য ধর্মের সালাত

সালাতের ঐচ্ছিক প্রকারসমূহের আলোচনা ও মানব জীবনে সেগুলোর প্রভাব পর্যবেক্ষণের পূর্বে আসুন একবার অন্যান্য ধর্মের ইবাদতসমূহের হাল-হকীকতও একটু তলিয়ে দেখার প্রয়াস নিই। ইবাদত সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম তাদের অনুসারীদের কাছে কি ধারণা পেশ করেছে, বিশেষত সালাতের আকৃতিই বা সে সব ধর্মের দৃষ্টিতে কি, সে সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা অর্জন করি। অবশ্য এ কথা সত্য, বিচিত্র ধ্যান-ধারণা, নিত্য পরিবর্তনশীল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আন্দাজ-অনুমানের গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে সঠিক তথ্য উদ্ধার করা এবং একটা সুস্পষ্ট ও নিখুঁত চিত্র পেশ করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভবও বটে। কিন্তু তবু আমাদেরকে এ অসাধ্য সাধন করতে হবে। কেননা ইসলামী ইবাদত পদ্ধতির সাথে অন্যান্য ধর্মের ইবাদত পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমেই আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, ইসলাম আল্লাহ্ পাকের কত বড় নিয়ামত যা আমরা বিনা পরিশ্রমেই লাভ করছি এবং এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কী পরিমাণ শোকর আদায় করা উচিত! সর্বোপরি এই তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ঘরের ও বাইরের শত্রুদের উপর্যুপরি আঘাত আক্রমণে জর্জরিত হয়েও এবং বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও ইসলামী ইবাদত পদ্ধতি নিজেকে বিকৃতি ও পরিবর্তনের কবল থেকে কী আশ্চর্য রকম মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের মসজিদে নববীর সালাত আজকের হিন্দুস্তানের যে কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের অখ্যাত একটি মসজিদের সালাতের মধ্যে অন্তত আকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই।

ইয়াহূদী ধর্মে

ইয়াহূদী ধর্মে সালাতের আহ্কাম ও বিধিবিধান তার আকৃতি ও রূপরেখা খুবই অস্পষ্ট ও এলোমেলো। ইয়াহূদী ধর্মের সকল উৎস-গ্রন্থ ঘেঁটেও সালাতের এমন একটি সার্বজনীন ও সামগ্রিক রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব নয় যা বংশপরম্পরায় সকল যুগে, ধর্মের সকল অনুসারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ছিল যেমনটি দেখা গেছে ইসলামের বেলায়, বরং যুগ বিবর্তনের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে ইয়াহূদী ধর্মের সালাত পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে বরাবর। অত্যুৎসাহী সংস্কারবাদীদের বেপরোয়া হাত বারবার কাঁচি চালিয়েছে এর ওপর, এমন কি আজো সেই পর্যবেক্ষকের ধারা অব্যাহত রয়েছে। একজন

ঐতিহাসিক কিংবা পর্যবেক্ষকের জন্য ইয়াহূদী ধর্মের সালাত ব্যবস্থার আদি রূপ ও প্রারম্ভিক আকৃতির (যা বনী ইসরাইলের নবী, আলেম ও ধর্মশাস্ত্রবিদদের আমলে প্রচলিত ছিল) সন্ধান লাভ করা চাট্টিখানি কথা নয়। এখানে আমরা আমেরিকার স্বনামধন্য ইয়াহূদী পণ্ডিত SAMUEL S. COHON (আমেরিকার Hebrow Union College, Cincinnti, Ohio-তে ধর্মবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর)-এর একটি সারগর্ভ প্রবন্ধের সারাংশ পেশ করছি :

"যদিও তাওরাতে সালাতের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে 'ইবাদত শুধু বলিদান ও কোরবানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তথাপি সালাত[১] ও প্রার্থনাকেই তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম অবলম্বনরূপে বিবেচনা করত। ইয়াহূদী ধর্মনেতাগণ প্রচলিত ও গতানুগতিক কুরবানী প্রথার প্রায়ই তীব্র সমালোচনা করতেন এবং দু'আ প্রার্থনার ওপর অধিক জোর দিতেন, এমন কি ইয়াহূদীদের একটি অংশ (বনী আরমিয়া) জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা, জটিল সমস্যাবলী ও সীমাহীন কর্মব্যস্ততা থেকে পালিয়ে গিয়ে তাওবা ইস্‌তিগফার, দু'আ ও মুনাজাতে মশগুল থাকাকেই শ্রেয় মনে করত। বাবেলের (ব্যাবিলন) নির্বাসিত ইয়াহূদীদেরকেও তারা দু'আ ও 'ইবাদত এবং আরাধনা ও মুনাজাতে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে তোলার উপদেশ দিত। 'সফর-ই-মাযামীর'-এর রচয়িতাগণ তাদের নিরলস চেষ্টা দ্বারা ইয়াহূদী ধর্মের গণপ্রার্থনা ও 'ইবাদত ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন এবং একে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হন।

ইয়াহূদী আলেমগণ তাওরাতে সালাত ব্যবস্থার বুনিয়াদ তালাশ করে করে গলদঘর্ম হয়েছেন। অবশেষে নিচের এ শ্লোকটি তাদের হস্তগত হয় ঃ

"তোমরা তাঁর প্রতি প্রেম নিবেদন কর এবং সর্বান্তকরণে তাঁর 'ইবাদত কর।"

---

১. কিন্তু আল-কুরআন ঘোষণা করছে বনী ইসরাঈলের নবী ও নেক্‌কার লোকেরা নিষ্ঠার সাথেই সালাত আদায় করতেন। দেখুন সূরা আম্বিয়া। হযরত ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়াকূবের ঘটনা, সূরা মার্‌য়ামে হযরত 'ঈসা ('আ.)-এর বক্তব্য। সূরা আল-'ইমরানে হযরত মার্‌য়ামকে বলা হচ্ছে, 'হে মারয়াম! রুকূ'সিজদাকারীদের সাথে তুমি রুকূ'-সিজদা করো।' আল-কুরআন আরো জানিয়েছে, য়াহূদীরা একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে সালাতের প্রতি উদাসীনতা ও গাফিলতি প্রদর্শন শুরু করেছিল। সূরা মার্‌য়ামে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেনঃ "এরপর একদল অপদার্থ তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা সালাত বরবাদ করল, প্রবৃত্তির পেছনে ছুটল; অচিরেই তারা তাদের ফল ভোগ করবে।

'ইবাদত ও প্রার্থনার অর্থে হিব্রু ভাষায় যে ক'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে শব্দগুলো খুবই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ও অস্পষ্টভাবে ইয়াহূদীদের নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করে তার মধ্যে Tephillah শব্দটি অন্যতম। এ শব্দটির তরজমা গোল্ড জিহের এভাবে করেছেন, "আল্লাহ্‌কে শাসক মেনে নিয়ে তাঁর সামনে একান্তভাবে নত হয়ে যাওয়া এবং বিনয় বিগলিত হয়ে প্রার্থনা করা।

এককালে ইয়াহূদীদের মধ্যে কয়েক ধরনের সালাত বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের সালাত, নতুন চাঁদের সালাত, শনিবারের সালাত, পবিত্র দিবসসমূহের সালাত ও পাপ মোচন দিবসের সালাতই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইয়াহূদীদের সনাতন 'ইবাদত ব্যবস্থায় নারীদেরকে পুরুষদের থেকে পৃথক রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মস্তক ঢেকে রাখা, অবনত করা ও বিশেষ ভঙ্গিতে সালাতে দাঁড়ানো অপরিহার্য বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।[১] সেই সাথে 'বিশেষ প্রার্থনা' পাঠের সময় তিন কদম পিছিয়ে আসার নির্দেশও আছে। সূর্যোদয় কালীন সালাতে সকলকে বিশেষ ধরনের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতে হতো এবং বাম হাতে ও মাথায় বিশেষ ধরনের তাবীয (যাকে কালাকতীর বলা হতো) ধারণ করতে হতো। তের বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক পুরুষের জন্যেই এ ধরনের তাবীয ধারণ আবশ্যকীয় ছিল। ইয়াহূদীদের সালাত ব্যবস্থায় ইমাম (পুরোহিত) ও মুকতাদীদের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কেননা আল্লাহ্‌র সামনে সকলেই বরাবর।

নব্যপন্থী ও প্রগতিবাদী ইয়াহূদীরা 'ইবাদতের মধ্যে সঙ্গীত ও মিউজিক সংযোজনের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিল, এমন কি এজন্য তারা বিশেষ সঙ্গীতও রচনা করেছিল। তাদের যুক্তি হলো, সঙ্গীতের সুর মূর্ছনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের গভীরে 'ইবাদতের আবেদন পৌঁছে দেয়া খুবই সহজ। এছাড়া 'ইবাদত মানুষের অন্তরে উল্লেখ্যযোগ্য কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না, পারে না ইবাদতকারীর হৃদয় বীণার তারে ভাবের ঝঙ্কার তুলতে। সম্ভবত এই নব্যপন্থীদের রুচিবোধ যথেষ্ট পরিমাণেই জাগ্রত ছিল, ছিল সৌন্দর্যের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ। তাই তারা নারী-পুরুষ পৃথক কাতারে দাঁড়ানোর পুরনো ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়, এমন কি মস্তকাবরণ কিংবা চাদর গায়ে দেওয়াও তারা জরুরী মনে করত না।

১. মনে হয় ইয়াহূদীদের সালাতে সিজদার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল-কুরআনে যেখানে ইয়াহূদীদের সালাতের আলোচনা করা হয়েছে সেখানেও শুধু রুকূ'র কথাই উল্লেখ আছে।

যেহেতু এই নব্যপন্থী দলটি শনিবার ও বিশেষ বিশেষ দিবসে সালাত আদায়টাই যথেষ্ট মনে করত, সেহেতু তাবীয ধারণের প্রথাও আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবতা পালন করাকেই তারা সালাতের জন্য যথেষ্ট মনে করত।

ইয়াহূদী সালাতে গান-সঙ্গীতের এই বেপরোয়া অনুপ্রবেশের ফলে সালাতের মূল উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে গেছে, মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে ইবাদতের ভাবমূর্তি। ফল এই দাঁড়িয়েছে, প্রগতিবাদী ও প্রাচীনপন্থী উভয় দলের সালাতই 'ইবাদতের রূহ বা প্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, খুশু-খুযূ' তথা অন্তরে আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্-প্রেমের ভাব সৃষ্টি হওয়া, সেই সাথে হৃদয়-প্রাণ এককভাবে আল্লাহ্র দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়াই ইবাদতের রূহ বা প্রাণ। শেষ পর্যন্ত ইয়াহূদীদের 'ইবাদতখানায় এই সুর সঙ্গীতেরই অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মজার কথা, 'ইবাদত-সঙ্গীতের মূল রচয়িতা সঙ্গীতবিশারদগণ নিজেরাই ইয়াহূদী ছিলেন না।"

ইয়াহূদীদের বিশ্বকোষ Jewish Encyclopaedia-তে "ইয়াহূদীদের নামায" শীর্ষক নিবন্ধে যে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতেও উপরোল্লিখিত বক্তব্য ও ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে আমরা উক্ত নিবন্ধের কয়েকটি বিশেষ অংশ তুলে ধরছি :

"হে ইসরাঈলীগণ! আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

উপরিউক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে সালাতের পূর্বে ইয়াহূদীদের বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিত। প্রাচীন কালের নিষ্ঠাবান ও ধর্মভীরু লোকেরা এই প্রস্তুতি পর্বেই এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করত। আযরার (EZRA) নির্দেশ অনুযায়ী সালাতের পূর্বে বিশেষ যত্নের সাথে গোসল করা এবং সালাতের উপযোগী কাপড় পরিধান করা জরুরী ছিল। সালাতের 'প্রার্থনা' দাঁড়ানো অবস্থায় পবিত্র ভূমির দিকে মুখ করে পাঠ করা উচিত। এ কারণেই 'আমীদা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। সালাতের জন্য কোন উঁচু স্থানে দাঁড়ানো উচিত নয়, বরং নীচু জায়গায়ই সালাত আদায় করা উচিত। উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে যেমন ফিরিশতাগণ দাঁড়ান। প্রার্থনা পাঠকারীকে নিজের উভয় হাত প্রসারিত করে পবিত্র প্রভুর উদ্দেশে উঁচু করতে হবে। দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণ কীর্তনের সময় আনত

ঝুঁকে যেতে হবে এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে উঠতে হবে। আমীদার পর প্রার্থনাকারী ব্যক্তি তিন কদম পিছিয়ে যাবে। অতঃপর ডানে ও বামে ঝুঁকে যাবে ঠিক যেমনটি আগেকার যুগে বাদশাহদের দরবার থেকে বিদায় নেবার বেলায় করা হতো। নিয়মিত সালাত সাধারণত কমপক্ষে দশজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সমাবেশে আদায় করা হয়, তবে অধিক জনসমাগমের স্থানে সালাত আদায় করাই উত্তম। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নামায অপরিহার্য, কিন্তু যুবতীদের জন্য তা নিষিদ্ধ।

সালাতের প্রার্থনা রচনা ও সম্পাদনার কাজ আশিজন নবীর যুগে এক শত বিশজন আলেম করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এটা আজো অজ্ঞাতই রয়ে গেছে, এই প্রার্থনা মুখে মুখেই মুখস্থ করিয়ে দেয়া হতো, না লিপিবদ্ধ আকারেও তা সংরক্ষিত ছিল। বাহ্যত এটাই মনে হয়, একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লোকেরা মুখে মুখেই তাদের প্রার্থনা মুখস্থ করে নিত। সম্ভবত Geonic-এর কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল।

রোমান ক্যাথলিকদের নামায

খ্রিস্ট ধর্মের পৃথক সালাত ও প্রার্থনা পদ্ধতির গোড়াপত্তন হয় চতুর্থ শতাব্দীতে খ্রিস্ট জগতের শীর্ষস্থানীয় পাদ্রী ও ধর্মীয় নেতাদের এক বৈঠকে।[১]

অবশ্য এর পর থেকে অদ্যাবধি এই সালাত ব্যবস্থায় যুগোপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের গুরু দায়িত্বটি ভ্যাটিকান কমিটি অত্যন্ত যত্ন ও সচেতনতার সাথে পালন করে আসছে এবং ক্যাথলিক বিশ্বকে সে সম্পর্কে যথারীতি অবহিত করছে। এজন্য তারা গোটা খ্রিস্ট জগতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। ভ্যাটিকান কমিটির পাশাপাশি গির্জার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনারও সালাত পদ্ধতি রুচিমত পরিবর্তন করার অধিকার আছে। এখানে আমরা ক্যাথলিক গির্জার অনুমোদিত সালাত ব্যবস্থার মোটামুটি একটা চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করব যা ভ্যাটিকান কমিটির পক্ষ থেকে জারিকৃত সর্বশেষ বুলেটিন সেন্ট পল পাবলিকেশন্‌স সিরিজ 'দি স্যাকরিফাইস অব দি ম্যাস' অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

---

১. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এ্যাথিক্‌স-এর 'খ্রিস্ট ধর্মে নামায' শিরোনামের নিবন্ধকারের মতে হযরত ঈসা ইয়াহুদীদের সাথে নামায ও প্রার্থনায় যোগ দিতেন। খ্রিস্ট ধর্মের প্রারম্ভিক যুগের ইমামগণ এ ধারা অব্যাহত রাখেন। খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম বংশধররা এই পদ্ধতির ওপরই নিজেদের 'ইবাদত ও প্রার্থনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং গীর্জা কখনই ইয়াহুদীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেনি, বরং ইয়াহুদীরাই খৃস্টানদের বহিষ্কৃত করে।

"পাদ্রী (সালাত ও প্রার্থনা পরিচালক বা ইমাম) যখন গির্জায় প্রবেশ করবেন তখন উপস্থিত সকলকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। অতঃপর ইমাম এই বলে সালাত আরম্ভ করবেন, "পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে আমি নামায পড়ছি।" এই পর্যায়ে ইমাম ও মুক্তাদীদের মাঝে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসাসূচক কিছু কথোপকথন হবে। অতঃপর ইমাম নিজের পাপ স্বীকার করে বলবেন, "আমি শক্তির অধিকারী প্রভু, কুমারী মারয়াম, সম্মানিত স্বর্গীয় দূত মিকাইল, বাপ্তিজ্‌ম দানকারী যোহন এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ পিটার ও পলকে সাক্ষী করে এবং আপনাদের (উপস্থিত) সকলকে সাক্ষী করে বলছি, আমি চিন্তায়, কথায় ও কাজে অসংখ্য পাপ করেছি। এ সকল পাপ আমি নিজেই করেছি এবং এগুলোর দায়িত্বও সম্পূর্ণভাবে আমার। অতএব, কুমারী মারয়াম, সম্মানিত স্বর্গীয় দূত মিকাইল, বাপ্তিজ্‌ম দানকারী যোহন, সম্মানিত প্রেরিত পুরুষ পিটার ও পল এবং আপনাদের সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, হে ভাই সকল! জগদীশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করুন!"

অতঃপর উপাসনা-অনুষ্ঠানে সমবেত সকলে ইমাম সাহেবের জন্য প্রার্থনা করেন। ইমাম সাহেব 'আমীন' বলতে থাকেন। এরপর প্রার্থনাকারিগণ পাদ্রীর কথিত 'স্বীকৃতি-বাক্য' আওড়াতে থাকেন, পাদ্রী সাহেবের কাছে প্রার্থনার আবেদন জানান। পাদ্রী সাহেব প্রার্থনা করলে সকলে 'আমীন' বলতে থাকেন। অতঃপর ইমাম বেদীতে আরোহণপূর্বক ল্যাটিন ভাষায় একটি বিশেষ প্রার্থনা পাঠ করেন এবং আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে বলতে থাকেন ঃ হে আল্লাহ্‌ ! আমাদের করুণা করুন! হে আল্লাহ্‌র পুত্র 'ঈসা! আমাদের করুণা করুন (একথাগুলো দু'বার উচ্চারণ করা হয়!) অতঃপর পাদ্রী সাহেব বেদী থেকে নেমে এসে আবার আল্লাহ্‌র করুণা প্রার্থনা করেন এবং উপস্থিত প্রার্থনাকারিগণ তার অনুকরণ করে থাকেন।

ক্যাথলিক গির্জার সাপ্তাহিক সালাত বা রবিবারের প্রার্থনা অন্যান্য দিনের মত সাধারণত তুলনায় কিছুটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রবিবারের প্রার্থনায় ইমাম সাহেব বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে একটি ভাষণ দেন। ভাষণের প্রারম্ভেই খ্রিস্ট ধর্মের কলেমা-ইঈমান তথা মৌলবাক্য ঘোষণা করা হয়। এই মৌলবাক্যটি সংক্ষিপ্তসার এই ঃ 'ঈসা (আ.) আল্লাহর একক পুত্র ও আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা থেকে তিনি সৃষ্টি (نعوذبالله); স্থান ও কালের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। তিনি তার পিতার অংশীদার এবং তিনিই সকল সৃষ্টির উৎস। মানবের

পাপ মোচনের জন্য পিতা তাকে আসমান থেকে প্রেরণ করেছেন। (এ মুহূর্তে ভাব বিহ্বল প্রার্থনাকারিগণ হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন) তখন কুমারী মেরী ও পবিত্রাত্মার মাধ্যমে মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করেন।

সালাতের পর ঐশ্বরিক ভোজের আয়োজন করা হয়। এ ভোজ ব্যবস্থার মূল উৎস হলো প্রাচীন যুগে গির্জায় আগন্তুক প্রার্থনাকারিগণ সাথে করে আঙ্গুরের মদ ও রুটি নিয়ে আসতেন এবং তা গির্জার বেদীতে উৎসর্গ করতেন। পাদ্রী সাহেব সেগুলো স্পর্শ করে দিতেন। অদ্ভুত শোনালেও এই সরল-প্রাণ ধর্মভীরুদের বিশ্বাস ছিল, পাদ্রী সাহেবের পবিত্র স্পর্শ লাভের পর এই রুটি ও মদ হযরত 'ঈসা (আ.)-এর রক্ত-মাংসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ভোজ উৎসবে যোগদানকারী ভাগ্যবান ব্যক্তিদের দেহে যীশুর রক্ত-মাংস মিশ্রিত হয়ে যায়! এখন কিন্তু রুটি ও মদের স্থানটি বেমালুম দখল করে বসে আছে টাকা-পয়সা ও সোনা-চাঁদি। তবে গির্জার পাদ্রী যে রুটি ও মদের ব্যবস্থা করেন না এমন ভাবা উচিত নয় যদিও পাদ্রী সাহেবের সে খরচটা আয়ের তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

এ সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার মাধ্যমে সালাতের সমাপ্তি ঘটে এবং প্রার্থনাকারিগণ গির্জা প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়।

প্রোটেস্ট্যান্ট দলের সালাত পদ্ধতি

প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জার সালাত পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে ক্যাথলিক গির্জার নামায পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে। প্রথমত প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলোতে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত, তাদের প্রার্থনার শব্দগুলো সুরপ্রধান যার ফলে প্রার্থনা পাঠ করা হয় ছন্দের তালে তালে। আরেকটি বিশেষ পার্থক্য, যীশুর ঐশ্বরিক সত্তার স্বীকৃতির সপক্ষে কোন সুস্পষ্ট শব্দ সেখানে অনুপস্থিত। প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জার একটি প্রার্থনা লক্ষ্য করুন :

"হে আসমানী পিতা! তুমি আপন প্রেম দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছ এবং আপন প্রেম দিয়েই আমাদের লালন-পালন করছ। তোমার প্রেম ও স্নেহই আমাদের পূর্ণতা দিতে পারে। আমরা পূর্ণ বিনয় ও অক্ষমতার সাথেই স্বীকার করছি, হৃদয়-প্রাণ দিয়ে তোমাকে প্রেম করতে পারিনি, এমন কি পরস্পরেও প্রেম করতে পারিনি– যেমন 'ঈসা 'মসীহ্' (আ.) আমাদেরকে প্রেম করেছেন।

আমাদের আত্মা অবশ্যই জীবন্ত। কিন্তু আমাদের অহংবোধ আত্মম্ভরিতা আমাদেরকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তোমার অযাচিত দয়া ও দান সম্পর্কেও আমরা উদাসীন থেকেছি। আমরা যেসব অপরাধ করেছি তা মার্জনা কর এবং আমাদের বর্তমান অবস্থা শুধরে দাও। ভবিষ্যতেও তুমি তোমার 'আত্মা'র মাধ্যমে আমাদের পথ-নির্দেশ কর যেন তোমার সৃষ্টি মাহাত্ম্য আমাদের অন্তরে যীশুর মাধ্যমে, যিনি আমাদের সরদার ও বাদশাহ, প্রবিষ্ট হতে পারে। গির্জায় সালাতের পূর্বে ঘণ্টা বাজিয়ে সালাতের সময় বার্তা ঘোষণা করা হয়, ইঞ্জীল থেকে একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনানো হয় এবং কলেমা তথা মৌলবাক্য কুরআনের সুরে পড়া হয়।

হিন্দু ধর্মের আরাধনা ও উপাসনা

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিস্তর পড়াশোনা ও গবেষণার পর একজন বিদগ্ধ গবেষক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবেন, হিন্দু ধর্মে সালাতের (হিন্দু পরিভাষায় 'পূজা') অবয়ব ও আকৃতিতে এবং রূপ ও প্রকৃতিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে, পদে পদে অসংখ্য পার্থক্য ও বিরোধ বিদ্যমান। এ পার্থক্য যেমন ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক, তেমনি ঐতিহাসিক ও ধর্মভিত্তিক। হিন্দু ধর্মের উপাসনা পদ্ধতির একটি সার্বজনীন ও সকল অনুসারীর নিকট গ্রহণযোগ্য কাঠামো যিনি আবিষ্কার করতে চান তিনি অবশ্যই হতাশার শিকার হবেন। মনে হবে তিনি যেন কঠিন ও দুর্গম চড়াই-উৎরাইয়ে পরিপূর্ণ ও অতল চোরাবালিবেষ্টিত এক গহীন অরণ্যে আটকা পড়েছেন। স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রবিদ ও আইন রচয়িতাগণ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পেশ করতে যথেষ্ট বিব্রতবোধ করেন। হিন্দু ধর্ম দর্শনের কোন পুরোধা পণ্ডিতের পক্ষেও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি তাদের উপাসনা-পদ্ধতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেশ করার। তবে আমার মনে হয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ও দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান টি. এম. পি. মহাদেভান (T.M.P. Mahadevan) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে Outlines of Hinduism (আউটলাইনস অব হিন্দুইজম)[১] যে চিত্র পেশ করেছেন তা এ পর্যন্ত পেশকৃত সকল ধারণার মধ্যে সর্বাধিক সুস্পষ্ট আর এই বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ডের সাধারণ 'ইবাদত ও উপাসনা পদ্ধতির মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। উক্ত মনীষী হিন্দু ধর্মের ইবাদত পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

১. ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ডঃ. রাধাকৃষ্ণ বইটির ভূমিকা লিখেছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

"হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিষ্ণু, শিব ও শক্তি–এই তিনটি মূর্তি খুবই জনপ্রিয়। ঘরে ঘরে ও মন্দিরে মন্দিরে বেশ জাঁকজমকের সাথে এগুলোর পূজা-অর্চনা হয়। কিন্তু উত্তরে কৃষ্ণ ও দক্ষিণে কার্তিক (Kartikaya) এই মূর্তি দু'টি হিন্দু সমঝদার শ্রেণীতে খুব জনপ্রিয়। হিন্দু ধর্মের সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকেরা এই তিনটি মূর্তি পূজা করে থাকে এবং এই তিনের মধ্যে এক উপাস্যের ধারণা পোষণ করে থাকে।

"একজন হিন্দু তার নিজ গৃহে একজন সম্মানিত অতিথির মতই উপাস্য মূর্তিকে স্বাগত জানায়। মন্দিরে প্রবেশের পূর্বেই মূর্তির চরণে উৎসর্গ করার জন্য ফল ও ফুল সংগ্রহ করে নেয়। উপাসনার সকল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই অতিথি বরণের আচার-নিয়মের সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়। মূর্তিকে সে স্বাগত নমস্কার জানায়। নির্দিষ্ট আসন পেতে দেয়া হয়। পা ধুইয়ে দেয়া হয়, প্রেম ও ভক্তি ভরে ফলমূল ও রকমারি খাদ্য পরিবেশন করা হয়। গলায় মালা ঝুলানো হয়, এমন কি বিভিন্ন মশলাসমৃদ্ধ পানও পেশ করা হয়। সবশেষে ভক্তি-আপ্লুত বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়।

"মন্দিরে দেব-দেবতার তেমনি আচরণ করা হয়, যেমনটি করা হয় রাজা-বাদশাহের বেলায়। গান ও সঙ্গীতের সুরে তাদের জাগ্রত করা হয়। স্নানের পর রাজকীয় পোশাক পরিধান করানো হয়। ফুল ও স্বর্ণালংকারে সজ্জিত করা হয়, এমন কি এই দেব মূর্তিগুলোর ভোজনের জন্যও নির্দিষ্ট সময় আছে। প্রত্যহ জাঁকজমকপূর্ণ দেব-দর্শন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এরা ভক্তদের দর্শন দান করেন। অভিযোগ ও প্রার্থনা শ্রবণ করেন। সকলকে আপন করুণা ও স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। বিভিন্ন পর্বে রাজকীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে দেব মূর্তিগুলোকে মন্দির থেকে বের করা হয়। এই দুর্বোধ্য মানবীয় নাটক হিন্দুস্থানের প্রায় প্রতিটি ঘরেই অভিনীত হতে দেখা যাবে।"

[আউটলাইনস্ অব হিন্দুইজম, পৃ. ৪৮-৫০]

হিন্দু উপাসনা ব্যবস্থার আরো নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন চিত্র এঁকেছেন য়ুরোপীয় Lious Renon (লুইস রেনান)। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (Hinduism)–হিন্দু ইজম-এ লিখেছেন ঃ

"যদিও প্রাচীনকালে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না, তথাপি মূর্তি তৈরি ও ভাস্কর্যশিল্পের উন্নতি ও উৎকর্ষের সাথে সাথে মূর্তি পূজার প্রচলন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে

থাকে। কাল বিবর্তনের ধারায় মূর্তি তৈরি করা এবং তা কোন উচ্চ বেদীতে স্থাপন করে জীবন্ত অস্তিত্বের মত তার পরিচর্যা করা এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

"ধর্মীয় আবেগ ও উষ্ণতার চরম প্রকাশের মূল উপায় হচ্ছে এই, উপাস্যের সাথে একজন সম্মানিত অতিথির ন্যায় আচরণ করতে হবে। এজন্য পূজারী প্রথমে তার উপাস্য দেবতা বা দেবীকে স্নান করায়, পোশাক-অলঙ্কারে সজ্জিত করে, সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে, আহার্য দ্রব্য পরিবেশন করে, পুষ্পার্পণ করে। মোম বাতি বা দীপালী হাতে চারপাশে ভক্তি-আপ্লুত কণ্ঠে গান গেয়ে মন্ত্র উচ্চারণের সাথে প্রদক্ষিণ করে। কখনও বা আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা বের করা হয়। বস্তুত এ স্থলে এসে প্রাচীন ধর্মীয় রূপকথা আর লোক-কথা একত্রে মিশে যায়।

"সম্ভবত সর্বসাধারণের একটা বিরাট অংশ এ মূর্তিগুলোকেই প্রকৃত উপাস্যরূপে ধারণা করে। এ কারণেই 'মূর্তিপূজা' শব্দটির প্রচলন হয়েছে। অনেকের মতে অবশ্য মূর্তি হচ্ছে বিভিন্ন মূল্যবোধ বা অতিমানবীয় সত্তার প্রতীক। তাই মূর্তির সেবা-যত্ন ও উপাসনা প্রকৃত অর্থে সেই মূল্যবোধ বা অতি মানবীয় সত্তারই উপাসনা।

"অনেক গোঁড়া হিন্দু আবার পূজা শুরু করার পূর্বে জবরদস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। যেমন গঙ্গা জলে স্নান করা, উপবাস ব্রত পালন করা, শ্বাস রুদ্ধ করে এক বিশেষ দেহ-ভঙ্গির সাথে উপবেশন করে সাধনা মগ্ন হওয়া ইত্যাদি। সাধনা নিমগ্ন ব্যক্তি এক কথা চিন্তা করতে থাকে, ভগবান তার দেহ ও আত্মায় প্রবিষ্ট হয়েছেন। এরপর সে গুনগুনিয়ে বিচিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে। আবার কখনও তা শুধু রাম রাম জপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই ইবাদত বা উপাসনা চিন্তা ও কল্পনাকে একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। হিন্দুদের ধারণা, উপাসক এতে এক অনুভূত আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে এবং তার পাপমোচন হয়।

"উপাসনার অন্যান্য পর্ব-অনুষ্ঠানে ধর্মগ্রন্থ পাঠসহ বিভিন্ন ধ্যান-সাধনাও যুক্ত হয়। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ যোগ-সাধনার বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। এটা অসম্ভব নয়, এই যোগ সাধনা মানুষকে তার আমিত্ব ও অহংবোধ থেকে আংশিক মুক্ত করতে সক্ষম হয়, তার আত্মা কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে। আর এই যোগ সাধনাকেই ভারতীয়

ধর্মসমূহ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বলে বিশ্বাস করে, এটাই হচ্ছে মানব জীবনের সুদীর্ঘ পথ সফরের মন্‌যিল।

সাধারণত অবশ্য পালনীয় উপাসনা বলতে তাই বোঝায় যা একজন হিন্দু নিজ গৃহে প্রত্যহ তিনবার সমাধা করে। সেগুলো হচ্ছেঃ প্রাত উপাসনা, মধ্যাহ্ন উপাসনা ও সায়াহ্ন উপাসনা। [পৃ. ১৪ ১৫, ১৬০]

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পদ্ধতিগত বিস্তর অমিল ও বিরোধ সত্ত্বেও হিন্দুস্তানের সকল অঞ্চলের উপাসনা পদ্ধতি দু'টি বিষয়ে এক ও অভিন্ন। প্রথমত সুর সঙ্গীতের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক। বস্তুত সারা হিন্দুস্থান চষে ফেললেও এমন একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যাবে না যেখানে গান-বাজনা, সঙ্গীত চর্চা কিংবা নিদেনপক্ষে বিশেষ ভঙ্গিতে হাত তালি দেয়া না হয়। হিন্দু ধর্মের অস্থি মজ্জায় মিশে আছে গান ও সঙ্গীত প্রেম। পূজারীর অন্তর ভাবাপ্লুত করার জন্য সব যুগেই হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ গান ও সঙ্গীতের আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মের বেলাও একথা সত্য ; মানবীয় হস্তক্ষেপের ফলে যে সব ধর্মে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং মানবীয় অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সেসব ধর্মের আসল পুঁজি। আইয়ামে জাহেলিয়াতের আরবদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেছেন

وَمَا كَانَ صَلٰوتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ـ

"কা'বা ঘরের সম্মুখে তাদের সালাত তালি বাজানো ও শিস দেয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

এ কথা যদিও মেনেও নেয়া হয় যে, ভাবসমৃদ্ধ ও মর্মবহুল গান কিংবা করুণ সুর-সঙ্গীত মানুষের কোমল অনুভূতিকে তরঙ্গায়িত করে, খুলে দেয় প্রেম ও ভক্তির অফুরন্ত উৎসধারা, তবু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, উপাসনা ও 'ইবাদতে সঙ্গীতের ও গান-বাজনার অনুপ্রবেশ 'ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য (খুশু'খুযূ' ও আল্লাহ্‌ভীতি, আত্মিক প্রশান্তি ও ভাব গম্ভীরতা) অর্জনে কিছুতেই সহায়ক নয়, বরং ইবাদতের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত মূর্তিপূজা স্থান ও কালের ব্যবধান ও পদ্ধতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দুস্তানের সকল অঞ্চলে সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান এবং হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শন মূর্তিপূজার উপকারিতা ও অপরিহার্যতার ওপর খুবই জোর দিয়ে থাকে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু ধর্ম সংস্কারক শংকর আচার্যও যিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ ঘটিয়ে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, মূর্তি পূজার সপক্ষে জোরদার ওকালতি করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং এটাকে তিনি ধর্মীয় চিন্তার উৎকর্ষের একটা স্বাভাবিক ও অপরিহার্য পর্যায় বলেও দাবি করেছেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ধর্ম বিভাগের প্রধান V.S. Ghate ইনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এ্যাথিক্স-এ তাঁর নিজস্ব প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"শংকর আচার্য মূর্তি পূজার ধারণা অস্বীকার করেন নি। প্রতিমাকে তিনি প্রতীক ও প্রকাশ ক্ষেত্র বলে মনে করতেন।" হিন্দু সাধারণের প্রিয় দেব-দেবতাসমূহের পক্ষে সমর্থন করে তিনি লিখেছেন ঃ

"বিবর্তনের ধারায় প্রতিমা পূজা আমাদের জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন। এই উপাসনার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক যখন পূর্ণশক্তি লাভ করবে এবং উৎকর্ষের চরমে পৌছে যাবে তখন তার আর মূর্তি পূজার প্রয়োজন থাকবে না, বরং তা পরিহার করা তার জন্য জরুরী হয়ে পড়বে।"

হিন্দু পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ মূর্তিপূজার পক্ষে যত ওকালতিই করুন এবং তার উপকারিতা ও কল্যাণের কথা যত জোর গলায়ই প্রচার করুন– একথা দিবালোকের মত সত্য যে, মূর্তি পূজা তাওহীদের নির্ভেজাল বিশ্বাসকে সমূলে ধসিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ভিত্ একেবারেই দুর্বল করে দিয়েছে। কেননা মূর্তিপূজক প্রকৃতপক্ষে মূর্তির অদৃশ্য কোন শক্তির কল্পনা করার ক্ষমতা তার একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। বিপদে ও প্রয়োজনে একবারও তার মনে পড়ে না সেই মহান সত্তার কথা যাকে সে মূল লক্ষ্য ও আসল কাঙ্ক্ষিত বলে স্বীকার করছে। বস্তুত এই সাময়িক বা অন্তর্বর্তীকালীন – হিন্দু শাস্ত্রকারদের ভাষায় – স্তর অতিক্রম করে পরম ও চিরন্তন সত্যের নাগাল পেয়েছে এমন লোকের সংখ্যা গোটা হিন্দুস্তানে আঙুলে গুণে শেষ করা যাবে। আরো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে গেলে এমন একজন লোকেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না সারা ভারতে। হৃদয়ের সবটুকু ব্যথা ও দরদ, দুঃখ ও কান্না নিয়ে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহ্ পাকের দরবারে যে অভিযোগ করেছিলেন মূলত সকল যুগের সকল মূর্তি পূজকের বেলায়ই তা সমান সত্য। আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সে অভিযোগের কথা আল-কুরআন বড় সুন্দর ভাষায় বিবৃত করেছেন ঃ

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

"প্রভু হে! এ মূর্তিগুলো অনেক লোককে পথহারা করে ছেড়েছে" অর্থাৎ এ মূর্তিগুলো অসংখ্য মানুষকে নিজেদের পূজা-অর্চনায় আবদ্ধ করে রেখেছে এবং মানুষকে তার মা'বুদে হাকীকী থেকে গাফিল করে দিয়েছে। ফলে মা'বূদে হাকীকীর প্রতি মনোযোগ দেয়ার এবং তার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের কল্পনাও তাদের অন্তরে কোনদিন জাগ্রত হতে পারে নি।"

সুন্নত, নফল ও বিতর

অন্যান্য ধর্মের সালাত তথা উপাসনা ও প্রার্থনা তুলনামূলক আলোচনার পর আসুন, আবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। ফরয সালাতের আগে ও পরে আরো কিছু সালাত আদায়ের নিয়ম রয়েছে, ইসলামী পরিভাষায় সেগুলোর নাম সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। এগুলো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে প্রমাণিত। সফরের সময় ছাড়া অত্যন্ত পাবন্দীর সাথে তিনি সেগুলো আদায় করতেন।

বস্তুত সুন্নতে মুওয়াক্কাদাহ্র উদাহরণ হলো দুর্গের হিফাজতের জন্য তার চারপাশে খননকৃত পরিখার মত কিংবা সেই চার দেয়ালের মত যা বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য উহার চতুর্দিকে নির্মিত হয়। যে ব্যক্তি ফরয নামাযের আগে ও পরে যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে সুন্নত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলবে, সে যেন ফরয সালাতের চারপাশে শক্তিশালী দেয়াল তুলে দিল! সুন্নতের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তাকে ফরয সালাতের ব্যাপারেও নিষ্ঠাবান ও একাগ্র করে তুলবে। এছাড়াও হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের দিন ফরয সালাতের বিভিন্ন ত্রুটি ও দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুন্নতে মুওয়াক্কাদাহ্ বিবেচিত হবে।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ রোযকিয়ামতে বান্দার কাছে সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব চাওয়া হবে সেটা হলো সালাত। সালাত যদি ঠিক থাকে তবে সে সফল ও কামীয়াবী হলো, আর সালাতে যদি কোন প্রকার গলদ ধরা পড়ে তবে তার কপাল পুড়ল! বান্দার ফরয সালাতে যদি কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, দেখ, আমার বান্দার আমলে নফল সালাত আছে না কি! সেই নফল দিয়ে ফরযের ত্রুটি পূরণ করা হবে। অন্যান্য আমলের বেলায়ও এরূপ করা হবে।"

হযরত ইবনে উমর্ (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাঁর ঘরে এভাবে সুন্নত পড়েছি ঃ জোহরের পূর্বে দু'রাকা'আত, জোহরের পর দু'রাকা'আত, মাগরিবের পর দু'রাকাত'আত ও এশার পর দু'রাকা'আত।

তিনি আরো বলেন ঃ হযরত হাফসা (রা.) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের সময় খুব সংক্ষিপ্ত দু'রাকা'আত পড়তেন।"

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি দিনরাতে বার রাকা'আত নফল সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি ভবন নির্মিত হবে ; জোহরের পূর্বে চার রাকা'আত, জোহরের পর দু'রাকা'আত, মাগরিবের পর দু'রাকা'আত, এশার পর দু'রাকা'আত ও ফজরের পূর্বে দু'রাকাআত।"

[তিরমিযী শরীফ]

হযরত আয়েশা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকা'আত পড়তেন এবং পরে মসজিদে গিয়ে সালাত পড়াতেন। ঘরে এসে আবার দু'রাকা'আত পড়তেন। অদ্রূপ ফজরের সময়ও তিনি দু'রাকা'আত পড়তেন। [মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফ]

এশার পর অথবা তাহাজ্জুদের সময় তিনি সালাত বিত্র আদায় করতেন। সফরে-হযরে তথা ঘরে-বাইরে কখনো এর অন্যথা হয় নি।

আবূ দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এরূপ ইরশাদ হয়েছে, "বিত্রের সালাত হচ্ছে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। যে বিতরের সালাত তরক করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" অন্য রিওয়াতে আছে, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে আরেকটি সালাত দান করেছেন যা লাল উটের (মূল্যবান সম্পদের) চেয়েও লাভজনক। আল্লাহ্ এ সালাতকে এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে রেখেছেন।"

[তিনমিযী, আবূ দাউদ শরীফ]

সুন্নতসমূহের মধ্যে ফযরের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার অধিকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোন নামাযকে অতটা গুরুত্ব দেননি যতটা গুরুত্ব ফজরের সুন্নতকে দিয়েছেন। [বুখারী]

আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, "তোমরা এটা (ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নত) তরক কর না। যদি ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে তবুও না।"

সালাত বিপদের বন্ধু

বস্তুত সালাত আল্লাহ্ পাকের এক অপূর্ব দান, এক অনন্য নিয়ামত! মু'মিনের জন্য এ এক মযবুত ঢালস্বরূপ। এমন এক বিশ্বস্ত বন্ধু, যে কোন বিপদে, যে কোন কঠিন মুহূর্তে তোমার পাশে এসে দাঁড়ায়। দূর করে তোমার মনের জমাটবাধা দুঃখ-পেরেশান, হতাশা ও গ্লানি। অস্থির বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে এনে দেয় এক অনাবিল প্রশান্তি। এজন্যই ইসলাম মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তগুলোতে বিশেষ সালাতের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন ভয়-ভীতির মুহূর্তে 'সালাতুল খাওফ। অনাবৃষ্টির কারণে 'সালাতুল ইস্তেস্কা'। সূর্য গ্রহণের সময় 'সালাতুল কুসুফ'। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে 'সালাতুল ইসতিখারা' এবং কোন জটিল সমস্যা ও প্রয়োজনের সময় 'সালাতুল 'হাজত'। এমনি মৃত্যু কিংবা শাহাদাত লাভের পূর্বেও সুযোগ হলে সালাতে দাঁড়াবার নির্দেশ রয়েছে। হযরত খুবায়ব (রা.)-কে যখন কুরায়শ-এর পিশাচরা ফাঁসিতে ঝুলানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল হযরত খুবায়ব তখন তাদের কাছে সময় চেয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেছিলেন। [বুখারী]

এ থেকেই আমরা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারি, পৃথিবীর সমস্যা-জর্জরিত ও বিপদসংকুল জীবনে একজন মু'মিনের জন্য সালাতের চেয়ে বড় কোন অবলম্বন নেই। একমাত্র সালাতের মাধ্যমেই সে তার স্রষ্টার কাছ থেকে পূরণ করে নিতে পারে তার সকল প্রয়োজন। একজন মুসলমানের জন্য তাই অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে সালাতকে জীবনের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও অকৃত্রিম সুহৃদরূপে বরণ করে নেয়া। কোন জটিল সমস্যা ও পেরেশানী কিংবা কোন কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার মুহূর্তে প্রথমেই তার কর্তব্য হচ্ছে সালাতের মাধ্যমে পরম করুণাময়ের চিরঅবারিত দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো এবং প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত সে দুয়ারেই ধরনা দিয়ে পড়ে থাকা। এই ছিল সালাতের সাথে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের সম্পর্ক। একজন সিপাহী তার তলোয়ারের ওপর, একজন মালদার তার অগাধ সম্পদের ওপর কিংবা একটি শিশু মায়ের মমতা লাভের জন্য তার আধো আধো কান্নার ওপর যতটা ভরসা করে, বিপদ ও

কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে সাহাবাগণ তার চেয়ে বেশি ভরসা করতেন সালাতের ওপর। সালাত যেন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যখনই কোন পেরেশানী ও বিপদ দেখা দিত, কোন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করত, শত্রু পক্ষের তীর বৃষ্টি শুরু হতো কিংবা বিজয় বিলম্বিত হতো তখনও তাঁদের চোখে ও মুখে বিরাজ করত এক অদ্ভুত প্রশান্তি। পরম নিশ্চিন্তে, একান্ত নির্ভরতার সাথে তুলে নিতেন তাঁদের শেষ অস্ত্রটি। সালাতের মাধ্যমে দু'হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যেতেন রাহমানুর রাহীমের দুয়ারে।

সাহাবা ও তাবেয়ীদের পুণ্য যুগ ছাড়াও যুগে যুগে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও নেক বান্দাদের এ-ই ছিল শান।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তিনি তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা, মেধা ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করেও কোন বিষয় বুঝতে কিংবা কোন সমস্যার জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে ব্যর্থ হতেন তখনই তিনি উঠে পড়তেন। চলে যেতেন লোকসমাগমহীন দূরবর্তী কোন মসজিদে। সালাতে দাঁড়িয়ে সিজদাবনত অবস্থায় হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়ে বিনয় কাতর কণ্ঠে তিনি এই দু'আ করতেন ঃ "হে ইব্‌রাহীমের শিক্ষাদাতা! আমাকে এ বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।" সালাত শেষে বাঁধভাঙ্গা রোনাজারির সাথে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতেন। ভিক্ষা মাগতেন সকল দাতার বড় দাতা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে। মুনাজাতের মধ্যে প্রায়ই তিনি হৃদয়ের দরদ ও আকুতি নিয়ে এ কবিতাটি পড়তেন ঃ

اَنَا الْمُكَدِّيْ اَنَا الْمُكَدِّيْ وَهٰكَذَا كَانَ اَبِيْ وَجَدِّيْ -

আমি তোমার দুয়ারে একজন মোহতাজ, ভিখারী এবং এটা আমি উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করেছি। কেননা আমার বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষরাও এ সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

তাহাজ্জুদের তাৎপর্য ও দা'ঈর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা

তাহাজ্জুদ হচ্ছে রূহ্ ও আত্মার শক্তি সঞ্চয়ের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। ঝিমিয়ে পড়া হৃদয়কে উষ্ণ ও সজীব রাখার এক শ্রেষ্ঠতম উপায়। এজন্যই আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে বারংবার তাকীদ করেছেন তাহাজ্জুদ তথা 'কিয়ামুল্লায়ল' সম্পর্কে। কিয়ামুল্লায়লে (ঘুম থেকে উঠে সুখশয্যা ত্যাগ করে

আল্লাহ্‌র দরবারে সালাতে দাঁড়ানো) অভ্যস্ত পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আল্লাহ্ পাক করেছেন যেন এর মর্যাদা ও গুরুত্ব ফরযের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়! পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে-সফরে সর্বদা অত্যন্ত পাবন্দির সাথে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন, এমন কি কর্মক্লান্তি ও ঘুমের প্রচণ্ড চাপের কারণে কখনও তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে দিনে তিনি তা আদায় করে নিতেন। ফলে বহু সংখ্যক আলিম এ মত প্রকাশ করেছেন, সম্ভবত তাহাজ্জুদের সালাত তাঁর ওপর ফরয ছিল।

আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلاً - نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً - اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً - اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً - اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً - اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً - وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً - رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً -

"হে বস্ত্রাবৃত! রাতে (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাকুন। হ্যাঁ, রাতের কিংদংশ ব্যতীত অর্থাৎ অর্ধরাত্রি কিংবা তার চেয়েও কিছু কম করুন কিংবা তার চেয়ে কিছু বৃদ্ধি করুন এবং কুরআন স্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করুন। আমি অচিরেই আপনার, এক গুরুভার বাণী অর্পণ করছি।" [সূরা মুয্যাম্‌মিল ঃ ১ – ৭]

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا -

"এবং রাতের কিছু অংশেও আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন যা আপনার জন্য অতিরিক্ত। অচিরেই আপনাকে আপনার প্রতিপালক 'মাকামে মাহমুদে' স্থান দেবেন।" [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯]

তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতি তাঁর আত্মনিমগ্নতা এ কথাই প্রমাণ করে, এ বিশেষ আমলটির প্রতি তাঁর পবিত্র হৃদয়ে ছিল অপরিসীম প্রেম ও সুগভীর অনুরাগ। তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে তিনি এমনই আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়তেন এবং এত দীর্ঘ কিয়াম ও রুকূ করতেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে উঠত।

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ কিয়াম করলেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে গেল। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল গোনাহ (যদি তা থেকে থাকে) ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাই বলে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? [বুখারী ও মুসলিম]

তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত নিয়েই সারা রাত কাটিয়ে দিলেন।

পুণ্যাত্মা সাহাবা কিরামের জীবন-চরিত, সীরাত, ইতিহাস ও হাদীসসম্ভার পর্যালোচনাকারী যে কোন ব্যক্তি খুব সহজেই এটা উপলব্ধি করতে পারেন, সে যুগে সর্বত্র তাহাজ্জুদের আমল জারি ছিল, বরং তাহাজ্জুদ তথা কিয়ামুয়াল্লায়লই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

মদীনা থেকে ফিরে এসে রোম সম্রাটের বিশেষ অনুচর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাদের পরিচয় তুলে ধরে ছিল দু'টি মাত্র শব্দে, "দিবসে তাঁরা ঘোড় সওয়ার, নিশিতে ইবাদত গুযার।"

সাহাবাদের বিষয়ে হযরত ইমাম হাসান বসরীর চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠভাবে আর কে জানতে পারেন? পরবর্তীদের জন্য তিনি সাহাবা কিরামের পুণ্য-চিত্র এঁকে গিয়েছেন এভাবে ঃ

"সত্যের ডাক তাঁদের কানে পৌঁছা মাত্র তাঁরা তা গ্রহণ করে নিলেন। এই সত্যের বিশ্বাস তাঁদের হৃদয়ের গভীরে শিকড় গেড়ে বসল। ফলে হৃদয়, বুদ্ধি, এমন কি তাঁদের চোখের দৃষ্টিও আল্লাহ্র ভয়ে, তাকওয়া ও পরহেযগারিতে অবনত হলো। আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা তাদের দেখতে তবে তোমাদের একথাই মনে হতো যেন সব কিছু স্বচক্ষে দেখেই তাঁরা বিশ্বাস করেছেন! তর্কপ্রিয় ও গোঁড়া লোকদের মত তাঁরা ছিলেন না। এঁরা সেই পুণ্যবান জামা'আত যাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশ শোনার সাথে সাথে মস্তক অবনত করে দিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাক কালামে তাই এঁদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ـ

"দয়াময় আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দা তারাই যারা যমীনে বিনয়নম্রভাবে চলে।"

[সূরা ফুরকান ঃ ৬৩]

তাঁদের রাত্রি যাপন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ـ

"আর যাঁরা রাত্রি যাপন করে আপন প্রতিপালকের দুয়ারে সিজদা ও কিয়ামে মগ্ন থেকে।" [সূরা ফুরকান ঃ ৬৪]

"এঁরা সেই পুণ্যবান জামা'আত যাঁরা রাত্রিভর সালাত ও সিজদায় নিজেদের নূরানী চেহারা ধূলি লুণ্ঠিত করে। তপ্ত অশ্রুধারা তাঁদের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র ভয় তাঁদের অন্তরে সদা জাগরূক থাকে।"

এরপর হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "কিছু একটা নিগূঢ় তত্ত্ব তো তাঁদের অবশ্যই জানা ছিল যার ফলে তাঁরা রাতের সুখ-নিদ্রা কুরবান করে এভাবে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিছু একটা নিগূঢ় তত্ত্ব তো তাঁদের অবশ্যই জানা ছিলো যা তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র ভয়ে সদা সচকিত করে রাখত!" [কিয়ামুল্লায়লকৃত মুহাম্মদ ইবন নসর]

বস্তুত তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লায়ল সকল যুগের সকল শ্রেণীর আহলুল্লাহ্, উলামা, মাশায়েখ, মুজাহেদীন, দা'ঈ (ইসলামী আন্দোলনের কর্মী) ও সংস্কারক তথা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়সূত্র। রাতের নিভৃতে কিয়াম, সালাত ও মুনাজাতের মাধ্যমেই তাঁরা বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতেন, খাদ্য আহরণ করতেন কিংবা আধুনিক পরিভাষায় জ্বালানি সংগ্রহ করতেন।

উষ্ণ-কোমল শয্যার প্রলোভন, সুখ-নিদ্রার প্রবল আকর্ষণ কোন কিছুই তাঁদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না তাঁদের সে নৈশ অভিযান থেকে। গভীর রাতের নির্জনতায় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের আহাজারি ও রোনাজারির সে দৃশ্য যারা কোনদিন দেখেনি ঘুমের ঘোরে বেহুঁশ সেই হতভাগারা কি করে বুঝবে, ছিন্নবস্ত্রাবৃত এই হকপন্থী উলামা ও আহলুল্লাহ্‌রা কোথা থেকে পেতেন দুনিয়ার সকল তাগূত চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি আর রাজরোষের মুখেও হক কথা প্রকাশের অভূতপূর্ব সাহস! আল্লাহ্‌র দীনের পথে নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবান করে দেয়ার প্রেরণাই বা লাভ করতেন কোন্ উৎস থেকে! জাগতিক

উপায়-উপকরণবঞ্চিত এ মিসকীনরা যুগে যুগে দীনের হিফাজত ও সংরক্ষণের কঠিন সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন কোন্ শক্তিবলে? কার গায়বী মদদে?

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম স্বীয় উস্তাদ ও শায়খ ইমাম ইবনে তায়মিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

"একবার শায়খ সারা রাত ইব্রাদতের পর ফজরের সালাত থেকে ফারেগ হয়ে যিকিরে বসে গেলেন। প্রায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তিনি যিকিরে মশগুল থাকলেন। অতঃপর আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ এটা হলো আমার নাশ্‌তা যদি এ নাশ্‌তা! থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই তবে আমি দুর্বল হয়ে শুকিয়ে যাব। আমার সকল শক্তি রহিত হয়ে যাবে।" [আল-ওয়াইল,কৃত ইবনুল কায়্যিম, পৃ. ৭১৯]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের নিজের ঘটনাও কম চমকপ্রদ নয়! সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেছেন ঃ আমার নজরে তাঁর যুগে তাঁর চেয়ে বড় ইবাদতগুযার দ্বিতীয় কেউ ছিলো না। তাঁর সালাতের মধ্যেও ছিল আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য। সে সালাত হতো খুবই দীর্ঘ।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী বলেন ঃ ইবাদত, তাহাজ্জুদ ও দীর্ঘ সালাতের ব্যাপারে তিনি শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। যিকরুল্লাহ্‌র প্রতি গভীর অনুরাগ, আল্লাহ্‌প্রেম ও আল্লাহ্‌ভীতি, মহান প্রতিপালকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও নিঃস্বতার উপলব্ধি এবং আবদিয়াতের চূড়ান্ত প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর অন্তরে সদা ও বিশেষ ভাব ও অবস্থা বিরাজ করত এবং এ সকল বিষয়ে আমি তাঁর কোন সমকক্ষ খুঁজে পাই নি।" [আল-বিদায়া- ওয়ান নিহায়া, খ. ১৪, পৃ. ৩৩৫]

মুসলিম উম্মাহ্‌র যে সকল ইমাম, উলামা, মুহাদ্দিসীন, মুজাহিদীন ও আহলুল্লাহর কথা ইতিহাস আজ গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, যাঁদের নজীরবিহীন ইখলাস, তাকওয়া, জিহাদ ও কুরবানীর কাছে মুসলিম উম্মাহ্ চিরঋণী হয়ে আছে, তাঁদের সকলের অবস্থাই ছিল এ রকম। সর্বাগ্রে তাঁরা ইবাদত, তাহাজ্জুদ, রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক পয়দা করে নিয়েছিলেন। আর এ চিরসম্পর্ক অটুট রাখার জন্য ছিলেন সদা সতর্ক। যুগে যুগে আহলুল্লাহ্‌দের পরিচয় লাভের এটাই ছিল মাপকাঠি। আজো এর ব্যতিক্রম নয়। আল্লাহ্ পাকের ফয়সালা এই, ঘুম ও গাফলত থেকে জাগরণ, মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ থেকে মুক্তি এবং নব জীবনের সজীবতা লাভ কিংবা

অধঃপতন থেকে উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষে অন্য কোন পথে আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, হবেও না কোনদিন।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ـ

"এটাই আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান তাদের ব্যাপারে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে আর আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কিছুতেই কোন রদবদল পাবে না।" [আহযাব ঃ ৬২]

নফল ও অধিক ইবাদতের সুফল

কলবের মলিনতা দূর করে রূহ ও আত্মার শুদ্ধি অর্জন, ঊর্ধ্ব জগতের সাথে গভীর প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন এবং হিদায়াতের জ্যোতি ও তাজাল্লী লাভের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সবচেয়ে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেটা হচ্ছে যত্ন ও নিষ্ঠাসহ ফরজ সালাত আদায়ের সাথে সাথে অধিক মাত্রায় নফল সালাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে এরূপ দেখতে পাবে যেরূপ ঐ (চাঁদ) দেখতে পাচ্ছ। এটা দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে তো তোমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই! অতএব, যদি এটা সম্ভব হয়, তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সালাত কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না তবে তা অবশ্যই করঃ এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ আপন প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।"
[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার ফজরের সালাতের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! আমাকে তোমার সেই আমলটির কথা বল যার বদৌলতে তুমি জান্নাত আশা করতে পার। কেননা আমি জান্নাতে তোমার মৃদু পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। হযরত বিলাল উত্তর করলেন, আমার এমন কোন আমল নেই যার ফলে জান্নাতের আশা করা যেতে পারে। অবশ্য দিনে কিংবা রাতে যখনই আমি ওযূ করি তখন সে ওযূ দ্বারা যতদূর সম্ভব হয় সালাত পড়ে নেই।

নফল ইবাদত হচ্ছে কলব ও হৃদয়ে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত ও প্রেম মজবুত করার এবং তার করুণা, রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের এক বিরাট অবলম্বন। কোন

কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে জান্নাতে তাঁর সাহচর্য প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ্র রাসূল তখন তাঁদেরকে অধিক নফল ও অধিক সিজদার উপদেশ দিতেন।

মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খাদিম আবূ ফারাস রাবী'আ ইবন কুআইব আসলামী (ইনি আহলে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত মহান সাহাবাদের একজন) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "আমি রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকতাম এবং ওযূ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতাম। একদিন তিনি ইরশাদ করলেন, কিছু প্রার্থনা কর। আমি আরয করলাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি ইরশাদ করলেন, এছাড়া আর কিছু নয়? আমি বললাম, আমি শুধু এটাই চাই। তিনি ইরশাদ করলেন, তাহলে অধিক সিজদা (তথা অধিক সালাত) দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।"

সদা নফল ইবাদতে মশগুল থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্র সামনে বান্দার ক্ষুদ্রতা, দীনতা ও নিঃস্বতার চরম প্রকাশ ঘটে। অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও প্রেম জাগ্রত হয়। ভেতরের সুপ্ত পাশবিকতা ও জৈবিক প্রবৃত্তিগুলো থেকে সহজেই পরিত্রাণ লাভ করা যায়। মূলত এই পাশবিকতা ও জৈবিক প্রবৃত্তিগুলোই হলো সব জুলুম, অত্যাচার, নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনের উৎস। তাই পবিত্র হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"যে সকল আমল দ্বারা আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে সেগুলোর মধ্যে আমার কাছে ফরযের চেয়ে পছন্দনীয় কোন আমল নেই। আর আমার বান্দা নিয়মিত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়ে যায়, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যায় যা দিয়ে সে শুনে। চোখ হয়ে যায়, যা দিয়ে সে দেখে। হাত হয়ে যায় যা দিয়ে সে মুকাবিলা করে। পা হয়ে যায় যা দিয়ে সে চলে। সে যখন আমার কাছে কোন বিষয়ে প্রার্থী হয় তখন আমি তাকে তার প্রার্থিত বিষয় অবশ্যই দান করি, আর যদি আমার আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।"

সালাত ও মুসল্লীদের মর্যাদার পার্থক্য

সালাত নির্দিষ্ট ছকে আঁকা নিছক ধরাবাঁধা কোন বিষয় নয় সকল মুসল্লী সব সময় একই গণ্ডিতে কিংবা একই সমতলে অবস্থান করতে বাধ্য হবে এবং

কখনও কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, বরং সালাত হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ও উষ্ণ প্রতিযোগিতার এক বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র। প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি নামাযী অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে, উন্মেষ থেকে পূর্ণতার পথে এবং পূর্ণতা থেকে চরমোৎকর্ষের পথে একের পর এক এমন সব স্তর অতিক্রম করে যেতে থাকে যা পূর্বে সে কল্পনাও করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যেক মুসল্লীর স্থান ও মর্যাদা পৃথক পৃথক। এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। সালাতের আহকাম ও হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ, জাহিল ও গাফিলদের সালাত কিভাবে সেই সালাতের সমমর্যাদা দাবি করতে পারে, যা পূর্ণ উপলব্ধির সাথে হৃদয়প্রাণ নিবেদিত করে পড়া হয়েছে? তদ্রূপ সাধারণ লোকের সালাত আর আল্লাহ্‌র মারেফাতধন্য আহলুল্লাহ্‌দের সালাত কি একই পাল্লায় ওজন করা যেতে পারে? এমন কি একই ব্যক্তির আজকের ও কালকের মধ্যেও ঘটে যেতে পারে বিরাট ব্যবধান ! এজন্যই দু'ধরনের সালাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আল-কুরআনে। এক প্রকার সালাত সম্পর্কে যেমন বর্ষিত হয়েছে কঠোর নিন্দা ও তিরস্কার, তেমনি অন্য প্রকার সালাত সম্পর্কে রয়েছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সাধুবাদ। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ-وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

"এমন মুসল্লীদের জন্য অভিশাপ যারা তাদের সালাত সম্পর্কে গাফিল। (আর) যারা শুধু লোক দেখায় এবং সাধারণ জিনিসও আটকে রাখে।"

[সূরা মাউন ঃ ৪-৭]

দ্বিতীয় প্রকার সালাত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ -

"নিশ্চয় সে মুমিনগণ সফলতা লাভ করেছে যারা তাদের সালাতে 'খুশু' অবলম্বন করেছে।" [সূরা মু'মিনূন ঃ ১- ২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও দু'ধরনের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার সালাত হচ্ছে 'খুশু-খুযুপূর্ণ, ভাব সৃষ্টিকারী ও হৃদয় আর্দ্রকারী। আরেক প্রকার সালাত হচ্ছে গাফিল, অলস ও উদাসীনদের অন্তঃসারশূন্য ও প্রাণহীন সালাত। প্রথমোক্ত সালাত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তিনি ওযূ করলেন এবং ভালোরূপে ওযূ করলেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আমার ওযূর মত ওযূ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে এবং দিলে অন্য কোন খেয়াল স্থান দেবে না, তার অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

উকবা ইবনে আমের (রা.) রেওয়ায়ত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যখন ভালোরূপে ওযূ করে এবং দেহমন একাগ্র করে সালাত পড়ে তখন তার জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। [মুসলিম]

দ্বিতীয়োক্ত নামায সম্পর্কে হযরত আমর ইবন ইয়াসীন রেওয়ায়ত করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, মানুষ সালাত শেষ করে ফারেগ হয় এমন অবস্থায় যে, সে উক্ত নামাযের এক-দশমাংশ মাত্র লাভ করে। আবার কখনও বা এক-নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ লাভ করে।

[আবু দাউদ শরীফ]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই যে সালাত চুরি করে। সাহাবারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষ নিজের সালাতে কিভাবে চুরি করে? ইরশাদ হলো, অর্থাৎ রুকূ সিজদা কিছুই ঠিক মত করে না।

[মুসলিম]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মুনাফিকের নামায হলো, সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। যখন সূর্য লাল রং ধারণ করে এবং শয়তানের দু'শিংয়ের মাঝে অবস্থান নেয় তখন সে (চট করে) দাঁড়ায়। মুরগী যেমন ঠোঁট দিয়ে দানা ঠোঁকরায় তেমনি দ্রুততার সাথে চার রাক'আত নামায থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে। এতে আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণ খুব কমই হয়। [নাসাঈ]

সালাতের ব্যাপার প্রত্যেক মানুষের মর্তবা ও মর্যাদা পৃথক পৃথক। একজনের সালাতের সাথে অন্য জনের সালাতের কোন তুলনা করা যেতে পারে না। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সালাতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম সালাত। আবার হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সালাত হচ্ছে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাতের নিকটতম সালাত। এজন্য

মৃত্যুশয্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন রাসূল (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মসজিদে নববীতে সালাত পড়ানোর। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিশেষ কোন কারণে বারবার হযরত উমর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল দৃঢ় ভাষায় ইরশাদ করলেন ঃ আবূ বকর (রা.)-কে সালাত পড়াতে বল। সুতরাং এ নির্দেশের ওপরই আমল হলো।

সালাতের মাধ্যমেই মানুষের মর্তবা ও মর্যাদার সঠিক স্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। ইল্ম ও জ্ঞান, মেধা, প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা অবদান অন্য কোন কিছু দ্বারা নয়। সালাতই হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি যা দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে দীন ও ঈমানের কে কতটুকু অংশ অর্জন করতে পেরেছে। যে সকল মহান ব্যক্তিত্বের নাম উজ্জ্বল তারকার মত আজো জ্বলজ্বল করছে ইতিহাসের পাতায়, তাঁদের এ মান-মর্যাদা ও মরেও অমর হওয়ার এ সৌভাগ্য সালাতের মাধ্যমেই শুধু অর্জিত হয়েছে। বস্তুত তাদের সালাত ছিল সেই প্রাণবন্ত ও হাকীকতপূর্ণ সালাত যা ইহ্সান নামে আখ্যায়িত হয়েছে রাসূলে পাক হাদীসে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সালাত ও কুরআনের গুরুত্ব

নবুওত ছিল জগত আলোকারী সেই সূর্যের মত যার প্রখর কিরণ আলোকিত করে দেয় সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু। মানুষের শীতল অন্ধকার হৃদয়ে বিকিরণ করে আলো ও তাপ। নবুওত ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে একমাত্র যোগসূত্র। নবুওতের প্রদর্শিত পথ ধরেই আল্লাহ্ পাকের তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গাফিলতি, উদাসীনতা, জাহেলিয়াত ও গুমরাহীর অতলান্ত থেকে সৌভাগ্যের সোপান বেয়ে পৌঁছেছেন ইল্ম, হিকমত, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্যের সুউচ্চ শিখরে। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই অব্যাহত ছিল নবুওতের এ বরকতময় ধারা, যার সুসমাপ্তি ঘটেছে পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শেষ নবীরূপে শুভাগমনের মাধ্যমে। আল্লাহ্র প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম এবং তাঁর দাওয়াতই হচ্ছে ব্যাপকতম ও পূর্ণতম দাওয়াত, নিখুঁত ও সার্বজনীন জীবন বিধান। পরশ পাথরের মতই ছিল তার সংস্পর্শ যা এঁক মুহূর্তে মানুষের জীবনে এনে দিত আমূল পরিবর্তন। যাঁরা ছিলেন মানুষ নামেরও অযোগ্য তাঁর পূর্ণ সংস্পর্শের বরকতে তাঁদেরই স্থান নির্ধারিত হলো ফিরিশ্তাদের কাতারে। যুগ যুগের সযত্ন লালিত হিংসা-বিদ্বেষ, পাশবিকতা ও হিংস্রতার স্থান দখল করে নিল দয়া, মহব্বত, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের মত মহৎ মানবিক গুণাবলী। শির্ক ও কুফরির অন্ধকার বিদূরিত

হয়ে ঈমান ও ইহ্সানের স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হলো মানুষের হৃদয়। সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সেই পূর্ণ যুগে তাঁর মুবারক উপস্থিতিই ছিল আল্লাহ্র নৈকট্য ও সান্নিধ্যের মনযিলে মক্সুদে পৌঁছার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের হিকমতপূর্ণ বিধানে তাঁর বরকতময় জীবনেরও একটা সীমা ও মুদ্দত নির্ধারিত ছিল এবং সেটা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ

"মুহম্মদ একজন রাসূল বৈ অন্য কিছু তো নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল বিগত হয়েছেন।" [সূরা আল্-ইমরান ঃ ১৪৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোনীত দীনের পূর্ণতা বিধান করেছেন, পূর্ণ করেছেন মানুষের জন্য তাঁর প্রেরিত নিয়ামত। সেই সাথে নাযিল হয়েছে আল-কুরআনের আয়াত ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন–(জীবন ব্যবস্থা) রূপে নির্বাচিত করলাম।" [সূরা মায়িদা ঃ ৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের সাথে আল্লাহ্ পাক নবুওত ও ওহীর অব্যাহত কল্যাণ ধারার সুসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এ কথার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন ; তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং নবীদের শেষ।" [সূরা আহযাব ঃ ৪০]

বস্তুত তাঁর তিরোধানের পর যমীনের সাথে আসমানের সেই যোগসূত্র শেষ হয়ে গেল যা স্থাপিত হয়েছিল ওহী ও রিসালতের মাধ্যমে। মানবতার মুক্তি ও

কল্যাণের স্বার্থেই এ শূন্যতা পূরণের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল এমন একটি বিশ্বস্ত অবলম্বনের যা মখলুক ও খালেক তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবে। মানুষের শুষ্ক হৃদয়ে ঈমান ও ইয়াকীনের, ইল্‌ম ও হিকমতের এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার এক বেগবান স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্‌র বান্দাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। এক কথায় এমন একটি অবলম্বনের একান্ত প্রয়োজন ছিল যার ফলে নবুওতের পরেও নবুওতের কল্যাণ ও বরকত চিরঅব্যাহত থাকবে।

এই শূন্যতা পূরণের জন্য ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি দু'টি জিনিস দিয়ে গেছেন। একটি হলো আল্লাহ্‌র চিরন্তন বাণী আল-কুরআন। দ্বিতীয়টি হলো মু'মিনের মি'রাজ বা সালাত। বস্তুত আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে চিরন্তন সফলতা ও কামিয়াবী অর্জনের ক্ষেত্রে যে মহাগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা গোটা শরীয়ত ব্যবস্থার অন্য কোন বিধানের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ দু'টি মহান অবলম্বনের মাধ্যমেই যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্ ঈমান ও ইয়াকীন, ইল্‌ম ও মা'রিফাত, রূহানিয়াত ও লিল্লাহিয়াত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্যের সেই চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে যেখানে পৃথিবীর কোন প্রতিভাধর বিজ্ঞানী কিংবা কল্পনাবিলাসী দার্শনিকের কল্পনাও পৌঁছতে সক্ষম নয়। এ দু'টি অবলম্বন হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য আবেহায়াতস্বরূপ যা তাকে অফুরন্ত জীবন চাঞ্চল্য ও প্রাণ সজীবতা এবং রূহানী শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার উষ্ণতা দান করে। এ দু'টি মহান নিয়ামতের বদৌলতে ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে ও জীবনের বাঁকে আল্লাহ্‌র সাথে এই উম্মাহ্‌র সম্পর্ক নবুওতের পুণ্য যুগের মতই ছিল অটুট, মজবুত। এ দু'টি সম্পদ আঁকড়ে ধরেই ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহ্ সমসাময়িক বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে যথাযথ যোগ্যতা ও মর্যাদার সাথে। এ দু'টি নিয়ামতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌কে চিরকালের জন্য মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়া হয়েছে নতুন নবী ও নতুন রিসালত থেকে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ - هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ - هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ - مِنْ

قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ـ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ـ هُوَ مَوْلٰكُمْ ـ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

"'আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে যত্নবান হও যেমন যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তিনি তোমাদের নির্বাচিত করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনরূপ সংকীর্ণতা আরোপ করেন নি। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মিল্লাতে অটল থাক। তিনিই তোমাদেরকে মুসলমান নামে আখ্যায়িত করেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনের মধ্যেও, যেন রাসূল তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হন এবং তোমরা মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নিয়মিতভাবে সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের কার্য নির্বাহক এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক। কত উত্তম সাহায্যকারী।" [সূরা হজ্জ ঃ ৭৮]

সালাতের বাহ্য রূপ ও মর্ম উভয়ের সংরক্ষণই ফরয

সালাত হচ্ছে নবুওতের এক মহামূল্যবান 'মীরাছ' বা আমানত। তাই নামাযের বাহ্য রূপ (খুঁটিনাটি বিধি-বিধানসহ) সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় এক নসল থেকে অন্য নসল এবং এক যুগ থেকে অন্য যুগ পর্যন্ত হস্তান্তর হতে থাকা উচিত।

অবশ্য এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, সালাতের বাহ্য রূপ সংরক্ষণ ও হস্তান্তরের এ মহান প্রচেষ্টা ও সাধনা ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুগে নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলে আসছে। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ সালাতের বিধান সম্পর্কিত প্রতিটি হাদীস সংরক্ষণ করেছেন চুলচেরা বিচার, বাছাই ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর। আবার ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ সেই হাদীস ভাণ্ডার মন্থন করে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সালাতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান। এ মহান খিদমত আঞ্জাম দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম কুরবানী তাঁরা পেশ করেছেন, যে আশ্চর্য প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার নযীর বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর নেই।

তবে একথা আমাদের ভুললে চলবে না, সালাতের বাহ্য রূপ হিফাজত ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছে দেয়া যেমন আমাদের

দায়িত্ব, তদ্রূপ সালাতের মর্ম, হাকীকত, সালাতের মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিকেও পরিপূর্ণ হিফাজত ও সংরক্ষণ করা এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও উপলব্ধির সাথে আগামী বংশধরদের হাতে পৌঁছে দেয়াও আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামাযেও জাহের-বাতেন তথা ভেতর বাইরে উভয় দিকেরই সমন্বয় ঘটেছিল। 'ইহ্সানের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করেছিলেন ঃ

"(ইহ্সানের অর্থ) এই, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তাঁকে তুমি দেখছ। আর যদি তাঁকে তুমি না দেখ (অর্থাৎ যদি এভাবে জাগ্রত হওয়ার মত কলবের উৎকর্ষ না ঘটে থাকে,তবে একথা ভাবতে চেষ্টা কর) তিনি তোমাকে দেখছেন।" [সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সালাত ছিল উপরিউক্ত ইহ্সানের পূর্ণতম ও সর্বোত্তম নমুনা।

আবূ দাউদ শরীফে হযরত মুতরিফ তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়েত করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁর সিনা মুবারক থেকে কান্নার এমন শব্দ বেরুত যেন (আটা পেষার) যাঁতা ঘর ঘর করে ঘুরছে।"

খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা কিরাম, তাবেয়ীন ও তাঁদের পর যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্র যে সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিগত হয়েছেন যাঁরা আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের সালাতের মধ্যেই রাসূলুল্লাহর সালাতের পূর্ণ ছায়াপাত ঘটেছিল। তাঁদের বাহ্যিক সৌন্দর্যমণ্ডিত মর্মসমৃদ্ধ সালাতের নিখুঁত চিত্র সংরক্ষিত রয়েছে ইতিহাস ও জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে।

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর আব্বা হযরত আবূ বকর (রা.) সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আবূ বকর ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের মানুষ। যখনই তিনি আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন চোখের পানি রোধ করা মুশকিল হয়ে পড়ত।" [সহীহ্ বুখারী, বাবুল হিজরত]

হযরত হাসান বস্রী বলেছেন, "হযরত উমর (রা.) রাতে ইবাদতের সময় (ভয় ও শাস্তির) আয়াত তিলাওয়াতের মুহূর্তে কান্নায় ভেঙে পড়তেন। এম

দাঁড়ানো অবস্থা থেকেও পড়ে যেতেন। আর খবর শুনে বন্ধুরা তাঁকে দেখতে ছুটে আসতেন।"

ইবনে উমর (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, "হযরত উমর (রা.) একবার ফজরের সালাতে এমন অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, আমি দ্বিতীয় কাতার থেকেও তাঁর কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।"

হযরত আলকামা বলেছেন, "একবার হযরত উমর (রা.) ইশার নামাযে সূরা ইউসূফ পড়ছিলেন। আমি শেষ কাতারে ছিলাম। যখন ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের কথা এলো তখন আমি তাঁর কান্নার আওয়ায শুনতে পেলাম।"

আবদুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ রিওয়ায়েত করেছেন, আমি শেষ কাতার থেকে হযরত উমর (রা.)-এর কান্নার আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি তখন এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন ঃ

إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللّٰهِ-

"আমার দুঃখ ও অভিযোগের কথা আমি আল্লাহ্র কাছেই পেশ করছি।"

[সহীহ্ বুখারী]

মুসলিম উম্মাহ্র সংস্কারক ও কর্ণধারদের কর্তব্য

মুসলিম উম্মাহ্র প্রত্যেক সদস্যের, বিশেষ করে এই উম্মাহ্র কর্ণধার, আলেম, সংস্কারক ও মাশায়েখদের পবিত্র দায়িত্ব এই, যে কোন মূল্যে তাঁরা এই মহামূল্যবান সম্পদের "যা তাঁরা প্রিয় নবী থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন" হিফাযত ও সংরক্ষণ করবেন, আবর্তন ও বিবর্তনের ঝড়-ঝাপটা, জড়বাদ ও বস্তুবাদের ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা থেকে হৃদয়রাজ্যের এ দীপশিখাকে বাঁচিয়ে চিরঅনির্বাণ রাখবেন এবং পরবর্তীদের হৃদয়রাজ্যেও তার স্নিগ্ধ আলো পৌঁছে দেবেন। কেননা এ আলো নিভে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে মানুষের হৃদয়রাজ্য গোমরাহীর চিরআঁধারে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া, আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অথচ এ সম্পর্কই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্র সকল শক্তি, বিজয়, উন্নতি, সফলতা ও কল্যাণের উৎস। আল্লাহ্ না করুন, এ সম্পদ যদি কোনদিন মুসলিম উম্মাহ্র হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে ফিকাহ্শাস্ত্রের বিরাট গ্রন্থসম্ভার, শরীয়তের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা, সুনিপুণ বক্তাদের অনলবর্ষী বক্তৃতামালা, বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ ও লেখক- চিন্তাবিদদের ক্ষুরধার লেখনী ও মূল্যবান গবেষণা– কোন

কিছুই সে ক্ষতি পূরণ করতে সক্ষম হবে না। ইসলামী পুনর্জাগরণ, বিপ্লব ও সংস্কার আন্দোলন তখনই শুধু সফলতা লাভ করতে পারে, যখন উম্মাহ্‌র বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের মধ্যেই ইশ্‌ক ও মুহব্বত, ঈমান ও ইয়াকীনের নিভু নিভু স্ফুলিঙ্গ আবার প্রজ্জ্বলিত হবে। নিদ্রার সুখ কুরবানকারী আশিকদের চোখের আসুতে জায়নামায ভিজে যাবে। প্রথম যুগের মুসলমানদের সালাতের জীবন্ত নমুনা উম্মাহ্‌র ঘরে ঘরে আবার যখন কায়েম হবে।

পবিত্র হিজরত ভূমি মদীনার পুণ্য মাটিতে সমাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী হযরত ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলায়হি যথার্থই বলেছেন ঃ

لَنْ يُّصْلِحَ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَااَصْلَحَ اَوَّلَهَا ـ

"এই উম্মাহ্‌র শেষ অংশকে সে জিনিসই সংশোধন করতে পারে যা এই উম্মাহর প্রথম অংশকে সংশোধন করেছিল।"

আল-কুরআনে ইরশাদ করছে ঃ

قَدْاَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ـ

"সেই মু'মিনগণ অবশ্যই সফলতা লাভ করেছে যারা তাদের সালাতে খুশু খুযু (একাগ্রতা) অর্জন করেছে।" [সূরা মু'মিনূন ঃ ১–২]

আমাদের প্রকাশিত কিতাব সমূহ

বইয়ের নাম	লেখকের নাম
মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
প্রাচ্যের উপহার	ঐ
বিধ্বস্ত মানবতা	ঐ
ইসলামী জীবন বিধান	ঐ
ঈমান যখন জাগলো	ঐ
ঈমান দীপ্ত কিশোর কাহিনী	ঐ
হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (র)	ঐ
আমার আম্মা	ঐ
সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস- ১ম খণ্ড	ঐ
সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস- ২য় খণ্ড	ঐ
সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস- ৩য় খণ্ড	ঐ
সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস- ৪র্থ খণ্ড	ঐ
সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস- ৫ম খণ্ড	ঐ
আরকানে আরবা'আ	ঐ
নয়া খুন	ঐ
কারওয়ানে মদীনা	ঐ
ইসলামঃ ধর্মঃ সমাজঃ সংস্কৃতি	ঐ
ছোটদের আলী মিয়া	ঐ
শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (র)	ঐ
তারুণ্যদীপ্ত হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান	ঐ
সীরাতে রাসূলে আকরাম (সা.)	ঐ
সালাত : তাৎপর্য ও গুরুত্ব	ঐ
সিয়াম : তাৎপর্য ও গুরুত্ব	ঐ
হজ্জ : তাৎপর্য ও গুরুত্ব	ঐ
যাকাত: তাৎপর্য ও গুরুত্ব	ঐ

বইয়ের নাম	লেখকের নাম
দাওয়াতের উপহার	মাওলানা কলিম সিদ্দিকী
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি	এ জেড এম শামসুল আলম
মুসলিম সংস্কৃতি	ঐ
বাঙ্গালী সংস্কৃতি	ঐ
নারীর শ্রেষ্ঠত্ব	ঐ
বিবাহ ও প্রেম	ঐ
সাহাবীদের সোনালী জীবন - ১ম খণ্ড	ঐ
সাহাবীদের সোনালী জীবন - ২য় খণ্ড	ঐ
সাহাবীদের সোনালী জীবন - ৩য় খণ্ড	ঐ
সাহাবীদের সোনালী জীবন - ৪র্থ খণ্ড	ঐ
পরিবার পরিজন	ঐ
বিবাহ ও যৌনতা	ঐ
শিশু পালন	ঐ
মহানবীর (সা.)পরিবার	ঐ
মাতৃভাষা আন্দোলন ও ইসলাম	ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী
ঘুষ ও হাদিয়া : কি কেন কখন কিভাবে	মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী
আদর্শ সমাজ গঠনে নামাযের ভূমিকা	আবদুল বাসেত কুরাইশী
মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল	মেজর জেনারেল আকবর খান
বিশ্বায়ন ঃ সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজী	ইয়াসির নাদিম
জিহাদে সিদ্দীকে আকবার	মেজর জেনারেল আকবর খান

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; সেলঃ ০১৭১১-২৬৬২২৮